বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত
একটি সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

সপ্তদশ বর্ষ □ দ্বিতীয় সংখ্যা | এপ্রিল-জুন 1995 | পাঁচ টাকা

এই সংখ্যায় থাকছে

রাজস্থানে মহিলা সমাজ-কর্মীদের ওপর নিপীড়ন

কৃষি চিত্র : সার বাড়ালে উর্বরতা কমে ?

বিহারে জল নিয়ে আন্দোলন

পরিবেশ দূষণের রকম-সকম

প্লেগ : বিশেষজ্ঞরা কি করছিলেন

নয়া অর্থনীতি : সংবাদ মাধ্যমের চোখে

নর্মদা প্রকল্পে ঠিকাদারি

ইউরেনিয়াম চুরি : এদেশে !

এবং

পরিবেশ আন্দোলন ও নীলেশ নায়েকের হত্যাকাণ্ড

আমাদের কথা

নতুন অর্থনীতি, নতুন নতুন কারখানা, নবীন (?) বিদেশী/বহুজাতিক পুঁজি, উদ্যোগ। খোলা বাজারের যুগ এখন। এই উপ-মহাদেশে আজ জোয়ার এসেছে তারই প্রচারে। রেডিও, টিভি, খবরের কাগজের মাধ্যমে 'নতুন' হাওয়া আজ রাঙিয়ে দিচ্ছে বেশ কিছু মানুষের মন, এক চকচকে মোহময় ভবিষ্যতের ছবিতে। এই 'সোনি' এল। এসে গেছে 'ওয়েস্টিং হাউস' বা 'সীমেন্স'। এরা আসছে, আনছে 'সমৃদ্ধি', 'আড়ম্বর', 'ঝকঝকে' জীবন-যাপনের স্বাদ ! আনছে কি না জানা নেই, তবে প্রচার অন্তত চড়া সুরে চেষ্টা করছে ছবিটা মনে গেঁথে দেবার। ফুরফুরে হাওয়ায় ভেসে যেতে যেতে বিজ্ঞাপন-সিনেমার উচ্ছল যুবক-যুবতীরা গড়ে তুলছে তারই নানান স্বপ্ন। যাতে আমাদের মন দুর্বল হয়ে পড়ে, মেনে নেয় সেই চিন্তার প্রাধান্য, যে চিন্তা বরফ ঠান্ডা কোকাকোলার বোতল দিয়ে আড়াল করে দেয় কেমিক্যাল কারখানা-শ্রমিকের ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া ফুসফুস। বর্জ্য পদার্থে বিষাক্ত হয়ে যাওয়া আদিগন্ত সবুজ মাঠকে লুকিয়ে রেখে মনের পর্দা জুড়ে এসে দাঁড়ায় সিঙ্গাপুর বা হংকং থেকে তুলে আনা কোনো শীততাপনিয়ন্ত্রিত সুপার-মার্কেট।

অর্থাৎ নিপীড়ণ চোখে পড়ছে না, হিংস্রতা চোখে পড়ছে না ! যেন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক-আই এম এফের যুগে, গ্যাটের যুগে এইসব উদ্যোগের মধ্যে সেটা নেই ! এই জায়গা থেকে গোয়ার যুবক নীলেশ নায়েকের হত্যাকান্ড আমাদের সামনে এক জরুরী বিপদ-সংকেত হয়ে উঠতে পারে। (দ্রষ্টব্য : পৃষ্ঠা 31) আমেরিকার মহাশক্তিশালী ব্যবসায়ী সংস্থা ডু পন্টের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল সে, আরও বহু নারী-পুরুষের

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

লেখা বা রিপোর্ট পাঠানো বা অন্যান্য যে কোন কারণে যোগাযোগ—

(1) অভিজিত লাহিড়ী
পি—252, লেক টাউন, ব্লক-এ,
কলিকাতা—700 089,
ফোন—34-7982

(2) সুভাষ গাঙ্গুলী
বি—22/8, করুণাময়ী
হাউজিং এস্টেট, সল্ট লেক,
কলিকাতা—700 091,
ফোন—359-0297

সাথে। গোয়ার কুয়েরিমে প্রস্তাবিত এশিয়ার সর্ববৃহৎ 'নাইলন সিল্ক সিল্ক' কারখানা-প্রকল্পর হাত থেকে সে চেয়েছিল গোয়ার 'নরম' পরিবেশ আর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনজীবনকে বাঁচাতে। আর এখানেই বিশ্ব-ব্যবসার নখ দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। ব্যবসারই ইঙ্গিতে রাষ্ট্র আক্রমণ নামিয়ে এনেছে প্রকৃতি ও মানুষকে বাঁচাতে চাওয়া আন্দোলনের ওপর।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি হত্যাকান্ডকেও স্মরণ করতে পারি। তবে এটি সরাসরি পরিবেশ আন্দোলনের ঘটনা নয়, প্রকল্পের ফলে উৎখাত হওয়া মানুষের পুনর্বাসনের সাথে জড়িত। নিষ্ঠুর এই ঘটনাটি ঘটে আমাদেরই ঘরের কাছে, সল্ট লেকে, সীমেন্স টেলি-যোগাযোগ কারখানায়। কারখানা তৈরী করার জন্য যাঁদের ঘর-জমি ছাড়তে হয়েছিল, তাঁরাই এসেছিলেন কাজ পাওয়ার দাবী নিয়ে। কারখানা গেটে রক্ষীর হাতের ছোঁওয়ায় স্বয়ংক্রিয় দরোজা বন্ধ হতে যাওয়ার সময় দরোজা ও দেওয়ালের মাঝে পিষে ভয়ঙ্কর এক মৃত্যুর শিকার হন স্থানীয় যুবক—সমীর।

এ বছর 5 জুন যাঁরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করছেন, নীলেশ-সমীরের মৃত্যুর গুরুত্ব তাঁদের কাছে অপরিসীম বলেই মনে হয়।

* * * *

নানান সংকটের মধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতেই 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। এই মুহূর্তে পত্রিকার কাজকর্ম চালানর জন্য কোন ঘর নেই। এ ব্যাপারে বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বর্তমান সংখ্যা থেকে পত্রিকার মাপ সামান্য বাড়িয়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা কিছু কমাতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও মূল্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল কিছু সমস্যার সামনে পড়ে আমরা এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। আশা করছি পাঠক-পাঠিকারা এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। □

সূচীপত্র

আমাদের কথা—1 □ রাজস্থান—নারী বিকাশ প্রকল্প / অনুবাদ ও সংকলন : কাজল রায়—3 □ জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস / কালমেঘ মন্ডল—7 □ শুখা মুক্তি অভিযান / মেঘনাথ ও রবীন—12 □ পরিবেশ দূষণের আরও রকম-সকম ও ক্ষয়ক্ষতি (তৃতীয় অংশ) / রবীন মজুমদার— 5 □ 'প্লেগ মহামারী' (১র চালচিত্র (প্লেগ চিত্র : চার) / অনুবাদ ও সংকলন : শর্মিলা—22 □ নয়া অর্থনীতি : পুরনো চিত্র / রবীন চক্রবর্তী—24 □ নির্মাণ-ঠিকাদারি-নয় ছয়, নর্মদায় যা চলছে / মূল রিপোর্ট : নিরঞ্জন হালদার— 8 □ প্লুটোনিয়াম নয় ইউরেনিয়াম এবার / র. চ.—30 □ নীলেশ নায়েক মৃত্যু— 1।

রাজস্থান—নারী বিকাশ প্রকল্প

কিছু তথ্য, কিছু আলোচনা

1984 সালে রাজস্থানের গ্রামে গ্রামে শুরু হয় মহিলাদের সচেতনতা বাড়ান ও তাদের নানান বিষয়ে ওয়াকিবহাল করে তোলার এক সরকারি কার্যক্রম। এর নাম দেওয়া হয় মহিলা বিকাশ প্রকল্প (উইমেন'স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা ডব্লিউ ডি পি)। খাতায় কলমে উদ্দেশ্য ছিল এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করা যেখানে গ্রামীণ মহিলারা উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নারী হিসেবে সমাজে তাঁদের শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে। একদিকে ইউনিসেফ অন্যদিকে বহুজাতিক কোম্পানিসহ নানান দেশী-বিদেশী টাকায় পুষ্ট এই প্রকল্প ছোট আকারে শুরু হয়েছিল। কিন্তু এর প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে প্রকল্পর মালিক কেন্দ্রীয় সরকার একে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দেয়। (এমন কি অন্যান্য রাজ্যেও এটা চালানর কথা ভাবা হয়েছিল।)

প্রকল্পর মূল দায়িত্বে আছেন সবচেয়ে নীচের স্তরের কর্মী 'সাথীন'রা। গ্রামের মেয়ে এই সাথীনরাই নিজেদের গ্রামে গ্রামে মেয়েদের সেলাই-ফোঁড়াই শেখানর থেকে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝানর মতো নানান বিষয়ে কাজ করছেন। এরকম 10টি কেন্দ্রের কাজ কো-অর্ডিনেট করার জন্য তৈরী করা হয় আর এক পদ 'প্রচেতা'। মূলত এই নীচের তলার কর্মীদের পরিশ্রমের ওপরেই প্রকল্পটি জোর কদমে এগোচ্ছিল।

শুরু হল দ্বন্দ্ব

এটা ঠিক যে মেয়েদের খানিকটা সচেতনতা বাড়ুক, তারা একটু দুর্বলতা কাটাক এটা একটা সরকারী প্রোগ্রামেরও লক্ষ্য হতে পারে। পুরনো ধর্ম-বর্ণ এবং পুরুষ কর্তৃত্ব মেয়েদের যে ভাবে দমন করে রেখেছে তাতে তাদের নিজেদের ইচ্ছেয় পরিবার পরিকল্পনার মত ব্যাপারে এগিয়ে আসায় বাধা অনেক। তাই স্থানীয় স্তরে একটু জড়তা ভাঙা অবধি ঠিক আছে। কিন্তু যেই সাথীন-প্রচেতাদের সাথে হাত হাতে মিলিয়ে নিজেদের জীবনের সমস্ত দিকই মেয়েরা লক্ষ্য করতে শুরু করে, চেষ্টা করে নিজের ভাগ্য, নিজের জীবনের ওপর আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে, তখনই প্রবল সমস্যা শুরু হয়। কারণ, যাইই হোক না কেন 'নারী বিকাশ প্রকল্প' তো একটা সরকারি, আমলাভিত্তিক উদ্যোগই বটে। তার অঘোষিত গন্ডীর বাইরে গেলেই শুরু হবে টেনশন, চাপ, নিপীড়ন, এটা বুঝেছেন ও বুঝছেন ওই সাথীন, প্রচেতারা। 'নারী বিকাশ প্রকল্পর' কাজ করতে গিয়ে তাঁরা নিজেরাই বদলাচ্ছেন, চিনছেন অনেক কিছু, লড়াইয়ে নামছেন অন্য বোনেদের সাথেই। বি ও বি-র পাতায় তাঁদের কাহিনী ছাপা হয়েছিল নভেম্বর-ডিসেম্বর '91 ও জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী '92 যুগ্ম সংখ্যায়। সেই লড়াইয়ের আরও বিবরণ প্রকাশ করেছেন বোম্বাইয়ের 'ফোরাম এগেইনস্ট অপ্রেসন অফ উইমেন' তাঁদের এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে। আমাদের লেখাটি সেখান থেকেই তৈরী।

সাথীন ঐক্যকে ভেঙ্গে দেবার প্রয়াস

পাঁচ সাথীনকে বিনাকারণে কাজ থেকে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে

রাজস্থানের বিভিন্ন জেলার সাথীনদের মধ্যে যে চাপা অসন্তোষ দানা বাঁধে তাকে কেন্দ্র করেই তাদের কাজের অধিকার ক্রমশঃ দাবির আকার নেয়। '90-র দশকের শুরু থেকেই একাধিক মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে তারা তাদের বিভিন্ন দাবি ডব্লিউ ডি পির কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে মন্ত্রী, আমলা, সমাজকল্যাণ দপ্তর সকলকেই জানাতে থাকে। 1993-র জানুয়ারীতে আজমীরের সাথীনরা তাদের ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রী করে এবং জুলাই মাসে জয়পুরে প্রথম সাথীন সম্মেলন হয়। বিভিন্ন মজদুর সংগঠন, মহিলা সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়নও এতে অংশ নেয়, বিভিন্ন জেলার সাথীনরা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে একটা দাবি পত্র তৈরী করে এবং আঞ্চলিক ও জেলা কমিটি নির্বাচন করে। এখানকার সিদ্ধান্ত অনুসারে সারা রাজ্য সাথীন কমিটি ডব্লিউ ডি পির হেড অফিসে একদিনের বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, এবং রাজ্যপালের কাছে অবিলম্বে ছাঁটাই হওয়া 5 জন সাথীনকে কাজে ফেরৎ নেওয়া এবং ডব্লিউ ডি পির নানান দুর্নীতির কথা জানিয়ে একটি দাবিপত্র পেশ করে। ডব্লিউ ডি পির নিপীড়নের শিকার ফতেগড় অঞ্চলের এক সাথীন কিভাবে তার মানসিক স্থিতি হারিয়েছেন তার কথাও উল্লেখ করা হয়। 1994 সালে তারা নারী শিশু ও স্বাস্থ্য দপ্তরের রাজ্যমন্ত্রী, মহিলা জাতীয় কমিশনের অধিকর্তা এবং প্রায় শ খানেক মন্ত্রী আমলাকে তাদের বাস্তব অবস্থার কথা জানায়, এবং ঐ বছরই এপ্রিল মাসে রাজ্য বিধানসভার বাইরে একদিনের বিক্ষোভ প্রদর্শন সাথীন আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। সাথীনদের এই একত্রিত হওয়ার ঘটনাতে ডব্লিউ ডি পির কর্তারা সাথীনদের উপর আর এক দফা দমন পীড়ন নামিয়ে আনে। প্রথমে নরমে গরমে তাদের সম্মেলনে যোগ না দেবার কথা বলা হয় এবং পরে ব্যাপক ভাবে ছাঁটাই করার ভয়ও দেখানো হয়, এমনকি ডব্লিউ ডি পির তরফ থেকে সাথীনদের বাড়ী বাড়ী এই মর্মে চিঠি পাঠানো হয়। (আজমীর জেলায় সাথীনদের স্বামীদের চিঠি দেওয়া হয় এই বার্তা জানিয়ে, যেন গৃহকর্তারা নারী বিকাশ প্রকল্পর সরকারী মোহর লাগান চিঠি দেখেই কেবলমাত্র বউদের বাড়ী থেকে বেরোতে দেয়), যেন তারা সম্মেলনে যোগ দিলে বাড়ী থেকেও তাড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর রাস্তায় ঘাটে সাথীনদের উপর শারীরিক কোন হামলা হলে নারী বিকাশ প্রকল্প তার জন্য দায়ী থাকবে না সেকথাও বলা হয়। সাথীন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের প্রথমে ভয় দেখিয়ে এবং পরে ভাল কাজ ও টাকার লোভ দেখিয়ে ভাঙ্গানোর চেষ্টা হয়। যেখানে সাথীনদের মাস মাইনে 200 টাকা সেখানে 15 দিনের এক প্রোগ্রামে তাদের দিন প্রতি 50 টাকা করে দেবার কথাও হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে ঋণ দান, উপহারের টাকা এসবতো আছেই। সাথীনদের একজনকে অন্যের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে এবং ইউনিয়ন ভাঙ্গানোর যতরকম কলা কৌশল আছে একে একে সব প্রয়োগই ডব্লিউ ডি পি ঘটায়। কূট কৌশলে সাফল্য লাভ না করতে পেরে ওপরওয়ালারা শেষ আঘাত হানে সাথীনদের নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিতে। '94 সাল থেকে তারা সাথীন পোষ্টে নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। এবং 21টা জেলায় সাথীন পোষ্ট থাকা সত্বেও তাদের রাখা হয় মাত্র 13 জেলায়।

প্রচেতা ইউনিয়নকে ভেঙ্গে দেবার কলা-কৌশল

'80-র দশক থেকেই বিভিন্ন জেলার প্রচেতারা তাদের কাজের অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন শুরু করে। ডব্লিউ ডি পি যখন থেকে সরকারি পরিবার পরিকল্পনাকে সফল করতে তৃণমূল স্তরের মহিলাদের উপর একে জোর করে চাপাতে থাকে এবং যেন তেন প্রকারেন তাদেয় টারগেট পূরণ করার প্রয়াস চালিয়ে প্রচেতাদের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, তখন থেকেই একে পাল্টা আঘাত হানার জন্য উদয়পুর জেলার প্রচেতারা সংগঠিতভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়লে পদমপুরা সাথীন মেলায় প্রচেতারা একত্রিত হয়ে ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এবং জয়পুর জেলার প্রচেতারা এর দায়িত্ব নেওয়ার কয়েকমাসের মধ্যেই নারী বিকাশ প্রকল্প-র ডিরেক্টর, সমাজ কল্যাণ সচিব এবং ডব্লিউ ডি পি'রই কিছু পেটোয়া মহিলা কর্মীরা প্রচেতাদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ

আয়োজন করে তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া মেটানোর অঙ্গীকার করে। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা ঘটে অন্যরকম। '95তে প্রায় 4 বছর পরে কর্তাদের হঠাৎ খেয়াল হয় প্রচেতা পোষ্টটা টেম্পোরারী এবং বর্তমান প্রচেতাদের কাজের সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়েছে। ফলে এরপরেই তারা কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় নতুন প্রচেতা নিয়োগ নিয়ে এবং পূর্বতনদের বলা হয় নতুনভাবে দরখাস্ত দিতে। প্রচেতা পোষ্টের এইভাবে চেলে সাজানোর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রচেতারা তাদের ইউনিয়ন রেজিঃট্রী করিয়ে রাজস্থান হাইকোর্টে এই বেআইনি নিয়োগের বিরুদ্ধে পিটিশন দাখিল করে। কোর্টের স্টে অর্ডারের ফলে বর্তমানে নিয়োগ বন্ধ আছে। একই সময়ে রাজস্থান কর্মচারী মহাসংঘ প্রচেতা ইউনিয়নকে তাদের সভ্যরূপে নির্বাচিত করে।

এতৎসত্বেও তিনজন প্রচেতাকে বিনাকারণে কাজ থেকে ছাঁটাই করা হয়। এবং পুনরায় আবেদন করা তিনজন প্রচেতাকে সুচতুর ভাবে সিলেকশন কমিটি বাতিল করে। এই তিনের মধ্যে ডব্লিউ ডি পি-তে 8 বছর কাজ করেছে একজন এবং বাকি দুজন 3 বছর কাজ করেছে। তাদের অদক্ষ কর্মী এই অজুহাতে বাতিল করা হয়।

সিলেকশন কমিটির এই সিদ্ধান্ত সংবিধান বিরোধী এবং যথেষ্ট নির্ভর-যোগ্য না হওয়ায় প্রচেতা ইউনিয়ন কোর্টে এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং মহিলা সমূহ, প্রচেতা ইউনিয়ন ও রাজস্থান কর্মচারী মহাসংঘ একত্রিত ভাবে কালেকটরেট অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। স্থানীয় প্রেসের মাধ্যমে এই ঘটনার কথা জানাজানি হওয়ায় নারী বিকাশ প্রকল্প-র ওপর উপরমহল থেকে চাপ আসতে থাকে, ফলে প্রজেক্ট ডিরেক্টর আবার প্রচেতাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার কথা জানায়। কিন্তু কার্যতঃ কোন কাজই এগোয় না। ঐ একই সময়ে দিল্লী ও জয়পুরের কয়েকটি মহিলা সংগঠন ভাতেরীতে এক সাথীনের ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। প্রচেতারাও সাথীনদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ ভাবে ঐ ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। এই সময় তাদের উপর হামলা হয়।

এতৎসত্বেও অদম্য প্রচেতা ইউনিয়ন 1992-র অক্টোবর মাসে তাদের প্রথম রাজ্য সম্মেলন করে। এখানে সমস্ত জেলার প্রচেতা এবং সাথীনরা ছাড়াও রাজস্থান কর্মচারী মহাসংঘের সদস্যরা মহিলা সমূহের সদস্যরাও যোগ দেয়। তাদের বিভিন্ন দাবির মধ্যে ছাঁটাই হওয়া তিন-প্রচেতাকে অবিলম্বে কাজে ফেরৎ নেবার দাবি জানানো হয়।

হাইকোর্টে যা ঘটেছে

1991-র মার্চে প্রচেতা কিরণ বিনা কারণে কাজ থেকে ছাঁটাই হওয়ার প্রতিবাদে হাইকোর্টে একটা রিট পিটিশন দাখিল করে। ফলে কোর্টের স্টে অর্ডারের মাধ্যমে নারী বিকাশ প্রকল্প বা ডব্লিউ ডি পি তাকে কাজে ফিরিয়ে নিলেও এপ্রিলেই তাকে বদলী করা হয় আজমীর থেকে সিলোরায়। 3 মাসের মধ্যেই আবার তাকে ফিরিয়ে আনা হয় আজমীরে এবং ছয় মাস যেতে না যেতেই কিরণকে বদলী করা হয় আরাইনে।

1992-তে কোর্টে কেস উঠলে ডব্লিউ ডি পি বলে যে, কিরণের পোষ্টটা ছিল টেম্পোরারী এবং সে কাজ থেকে ছাঁটাই হয় নি, তার কাজের সময়সীমা শেষ হয়েছে এবং পুনরায় এক্সটেনশন হয়নি। মজার কথা হল ছাঁটাই হওয়ার কয়েকদিন আগেই কিরণের হাতে এক্সটেনশন পত্র আসে, ঐ বছরই কোর্টের স্টে অর্ডার বলে কিরণ কাজে যোগ দেবার সময় তার হাতে দুটো দপ্তরী পত্র আসে। প্রথমটায় বলা হয় কাজের সময়সীমা শেষ হলেও কোর্টের স্টে অর্ডারের ফলে সে কাজে যোগ দিতে পারবে, এবং দ্বিতীয়টায় বলা হয় তার কেসটা জটিল হওয়ায় সে এই সময় সীমার মধ্যে কোন ছুটি পাবে না। ফলে 6 মাস ধরে কিরণ কোন ছুটি পায় না। তার চরম অসুস্থতার সময়ে হাসপাতালে দাখিল হওয়া কিরণের ছুটির আবেদন-পত্র কর্তৃপক্ষ বেমালুম হজম করে দেয়, এবং ঘোষণা করে কিরণ বেপাত্তা! পুলিশ পাঠিয়ে কিরণের পরিবারকে অপদস্থ করা এবং কাজ থেকে ফেরার পথে রাস্তায় অফিস কর্মচারীর মাধ্যমে তাকে হেনস্থা করার ঘটনাও ঘটে। এসবের বিরুদ্ধে পুলিশে ডাইরী করা হলেও কোন ফল হয় না, এবং 1993 সালে কিরণের বিরুদ্ধে কাজে অনুপস্থিতি, নিয়ম শৃংখলা ভঙ্গ

ইত্যাদির অভিযোগ আনা হয়।

1991তে পাঁচ সাথীন বিনা কারণে কাজ থেকে ছাঁটাই হওয়ার প্রতিবাদে ডব্লিউ ডি পি-র বিরুদ্ধে কোর্টে একটা পিটিশন দাখিল করে। '92 সালে রাজস্থান হাইকোর্ট এক রায়ে বলে যে, সাথীনরা যেহেতু এই প্রোগ্রামের মেরুদন্ড তাই তাদের ছাঁটাই আসলে সংবিধানে গৃহিত 'কাজের অধিকারকে'ই ভঙ্গ করেছে। কোর্ট অবিলম্বে এই পাঁচ সাথীনকে কাজে ফেরৎ নেওয়া এবং ছাঁটাই হওয়ার সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত তাদের প্রাপ্য বেতন মিটিয়ে দেবার কথা বলে। কিন্তু হাইকোর্টকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ডব্লিউ ডি পি এখন সাথীনদের কাজে ফেরৎ না নিয়ে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে।

নারী বিকাশ প্রকল্প কোন দিকে চলেছে?

শুরু থেকেই ডব্লিউ ডি পির ঘোষিত লক্ষ্য ছিল গ্রামের মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করিয়ে তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি করা। কিন্তু যখন নারী বিকাশ প্রকল্পর কর্তারা কালিকট নারী সম্মেলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে (?) সাথীন-প্রচেতাদের চাকরী থেকে ছাঁটাইয়ের হুকুম দিল তখন থেকেই অনেকে এই প্রকল্পর ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের আশংকা ছিল যে নারী-ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টার বদলে এই উদ্যোগ সরকারি প্রোগ্রামসমূহ (বিশেষ করে জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ) রূপায়নে রাষ্ট্রের এক দপ্তর হিসেবে সরাসরি কাজ করবে না তো? যেখানে নীচের তলার কর্মীদের সততার ওপর দাঁড়িয়ে এই প্রকল্প রাজস্থানের গ্রামের মহিলাদের অন্দরমহল অবধি পৌঁছোচ্ছে!

আজ কিন্তু এই ধারণা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। খোলাখুলিভাবেই নারী বিকাশ প্রকল্প, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ শিবিরের (লাবি) সাথে হাত মেলাচ্ছে। নতুন অর্থনৈতিক নীতি ও স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রামের স্বার্থে নারী বিকাশ প্রকল্পকে দিয়ে 'খোলা বাজারী অর্থনীতি'র গুনগান করিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

এর একটি প্রমান হল নারী বিকাশ প্রকল্পর মাধ্যমে এক গুচ্ছ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে গ্রামীন মহিলাদের জন্য যেখানে তাঁরা সার, কীটনাশক এবং হাইব্রীড বীজ ভিত্তিক বিতর্কিত 'আধুনিক' কৃষির নানান পদ্ধতি শিখবেন। পাশাপাশি নারী বিকাশ প্রকল্পর সংগঠনের মাধ্যমে 'নরপ্ল্যান্ট' বা 'নেট-এনের' মত বিপজ্জনক গর্ভ-নিরোধকের পক্ষে প্রচার করা হচ্ছে।

তাই আজ এটা বলা যায় যে সাথীন-প্রচেতারা যদি নেহাতই যন্ত্রের মত ব্যবসার স্বার্থ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষাকারী প্রোগ্রাম না চালিয়ে যান, তাঁরা যদি এর গতিপথ ও লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাহলে তাঁদের ওপরে নিপীড়ন নেমে আসতেই পারে। আজ যাঁরা একসাথে ইউনিয়ন গড়ছেন, কাল তাঁরা, বহুজাতিক কোম্পানীর তৈরী হরমোন ইনজেকশন রাজস্থানী নারীদের স্বার্থের চরম বিরোধী, এই প্রচার করতেই পারেন। তাই এই দমন-পীড়ন।

অনুবাদ ও সঙ্কলন : কাজল রায়

মূল রিপোর্টের কপির জন্য যোগাযোগ : ফোরাম এগেইনস্ট অপ্রেসন অফ উইমেন
29, ভাটিয়া ভবন, বাবুরেকার মার্গ, দাদার, বোম্বাই-400028

জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস

একটি প্রাথমিক আলোচনা

প্রসঙ্গ ঃ কৃষি

এইচ ওয়াই ভি ভ্যারাইটির চাষ করতে গেলে দেশি ভ্যারাইটির তুলনায় সার লাগে অনেক বেশি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই ধরনের চাষ সারের কোম্পানীগুলির ব্যবসা বাড়িয়ে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে সার কোম্পানীগুলি বাতাসের নাইট্রোজেন রাসায়নিক যৌগে আবদ্ধ করণের মাধ্যমে নাইট্রোগ্লিসারিন, টি এন টি ইত্যাদি বিস্ফোরক তৈরী করে মানুষ মারত, যুদ্ধ থামবার পর তারাই নাইট্রোজেন ঘটিত সার তৈরী করতে শুরু করে। সবুজ বিপ্লবের জনক বোরল্যাগের সেই 60 এর দশকে রাসায়নিক সারের পক্ষে ওকালতি প্রায় হিস্টিরিয়া রোগির মত হয়ে গিয়েছিল। 1967 সালে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক মিটিং-এ বোরল্যাগ বলেছিলেন "যদি আমি তোমাদের পার্লামেন্টের সদস্য হতাম তাহলে প্রতি 15 মিনিট অন্তর একবার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠতাম আর চিৎকার করে বলতাম সার দাও……চাষিদের আরও সার দাও"। এরপর শুরু হয় কৃষি জমিতে রাসায়নিক সারের যথেচ্ছ ব্যবহার।

পরিবেশ থেকে উদ্ভিদ মূলতঃ নিম্নলিখিত মৌলিক পদার্থগুলি সংগ্রহ করে (তালিকা নং 1) ঃ

তালিকা নং 1

মৌল (অতিমাত্রিক অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় প্রয়োজন)	শুষ্ককোষে পরিমাণ (%)	মৌল (স্বল্প মাত্রিক সামান্য প্রয়োজন)	শুষ্ককোষে পরিমাণ
1. কার্বন	45	1. ক্লোরিন	0.01
2. অক্সিজেন	45	2. ম্যাঙ্গানিজ	0.005
3. হাইড্রোজেন	6	3. বোরণ	0.002
4. নাইট্রোজেন	1.5	4. দস্তা	0.002
5. পটাশিয়াম	1.0	5. তামা	0.0006
6. ক্যালশিয়াম	0.5	6. মলিবডেনাম	0.00001
7. ম্যাগনেশিয়াম	0.2		
8. ফসফরাস	0.2		
9. সালফার	0.1		
10. লোহা	0.01		

এর মধ্যে কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন উদ্ভিদ সংগ্রহ করে বাতাস ও জলের মাধ্যমে, বাকি উপাদানগুলি উদ্ভিদ লবণ হিসাবে মাটি থেকে শোষণ করে। রাসায়নিক সারে প্রধানত নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম থাকে। এই মৌলগুলিই উদ্ভিদের বেশী পরিমানে প্রয়োজন এবং উদ্ভিদ রাসায়নিক সার থেকে মূলতঃ এই মৌলিক উপাদানগুলিই পায়। অন্যান্য অতিমাত্রিক ও স্বল্প-মাত্রিক উপাদানগুলি রাসায়নিক সারে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম থাকে। উদ্ভিদ প্রধানত মাটি থেকেই এগুলি সংগ্রহ করে নেয় ফলে মাটিতে এগুলির অভাব দেখা যায় এবং রাসায়নিক সার সেই অভাব মেটাতে পারে না (তালিকা নং 2)। এই মৌলিক

তালিকা নং 2

উচ্চফলনশীল শস্য চাষের ফলে জমি থেকে অনুখাদ্যের অপসারণ, যোগান ও ঘাটতি

একটি শস্য-পর্যায়ে হেক্টর প্রতি অনুখাদ্য অপসারণের পরিমাণ (gm/হেক্টর)

শস্য পর্যায়	বোরণ (B)	তামা (Cu)	দস্তা (Zn)	মলিবডেনাম (Mo)	ম্যাঙ্গানিজ (Mn)
9.5 টন ধান ও 9.0 টন খড়	56	76	191	3.5	645
13.0 টন আলু ও 2.5 টন ডাটা ও পাতা	31	13	14	1.0	18
7.2 টন গম-এর দানা ও 8.2 টন খড়	128	236	383	13.0	580
মোট	305	325	615	17.5	1243

1980-81 সালে হুগলী ও হাওড়া জেলায় হেক্টর প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ (kg/হেক্টর)

ব্যবহৃত সার

জেলা	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
হুগলী	62.4	27.5	14 6
হাওড়া	71.1	28.5	17·4

প্রযুক্ত সারে অনুখাদ্যের পরিমাণ (গ্রামে)

জেলা	বোরণ (B)	তামা (Cu)	দস্তা (Zn)	মলিবডেনাম (Mo)	ম্যাঙ্গনিজ (Mn)
হুগলী	0.69	1.99	3:33	0·48	6.18
হাওড়া	0.77	2.22	3.48	0.5	6·87

হুগলী ও হাওড়ায় জমিতে অনুখাদ্য ঘাটতির পরিমাণ (gm/ha/Year)

জেলা	বোরণ (B)	তামা (Cu)	দস্তা (Zn)	মলিবডেনাম (Mo)	ম্যাঙ্গানিজ (Mn)
হুগলী	304.3	323.01	611.66	17.01	1236.81
হাওড়া	304.2	322.7	611.51	19.96	1236.11

★ হুগলী ও হাওড়ায় ধান, আলু ও গম ছাড়াও ডাল ও বহু রকম সব্জির চাষ হয়, তাদের দ্বারা অপসারিত অনুখাদ্যের পরিমাণ দেওয়া গেল না। তাই জমিতে অনুখাদ্যের ঘাটতির পরিমাণও সঠিক নয়। তবে প্রদত্ত তথ্য থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে চাষ যাই হোক, রাসায়নিক সার থেকে অপসারিত অনুখাদ্যের খুবই সামান্য অংশ সরবরাহ করতে পারে।

উপাদানগুলি প্রধানত ফসলের দানায় এবং খড়ে সঞ্চিত হয়। এইচ ওয়াই ভি ভ্যারাইটিগুলি খর্ব হবার জন্য এতে দানা ও খড়ের পরিমান প্রায় সমান সমান হয়। কিন্তু দেশী ভ্যারাইটিতে শস্য দানার পরিমাণ খড়ের থেকে অনেক কম হয়। এইচ ওয়াই ভি-এর ক্ষেত্রে আমরা এটা বলতে পারি যে ওই মৌলিক উপাদানগুলির অন্ততঃ অর্ধেক দানায় যায়। তাই জমি থেকে সংগৃহীত মৌলিক উপাদানগুলির অর্ধাংশের জমিতে ফেরত যাবার সম্ভাবনা খুবই কম। খড়কে সরাসরি সার হিসাবে ব্যবহার করলে বা যে প্রাণী সেই খড় খাচ্ছে তার গোবর বা দেহাবশেষ জমিতে সার হিসাবে দিলে মৌলিক উপাদানগুলির জমিতে ফেরত যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সবুজ বিপ্লবের ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহারই শুধু বাড়েনি, কমেছে জৈব সারের ব্যবহারও। কারণ বিবিধ, প্রথমত জৈব সার ব্যবহারে ঝামেলা অনেক বেশী, তা রাসায়নিক সারের মত সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। দ্বিতীয়ত সবুজ বিপ্লবের ফলে ট্র্যাক্টর ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ায় হাল বলদের ব্যবহার কমেছে, তাই গ্রামের বহু বাড়িতেই আর গরু নেই। ফলে গোবর সার ব্যবহারের প্রশ্নও ওঠে না।** এই সব কারণে জমিতে ওই মৌলিক উপাদানের পরিমাণ ক্রমশ কমছে। এই মৌলিক উপাদান-গুলি উদ্ভিদের নির্দিষ্ট শরীর বৃত্তিয় কার্য সম্পাদন করে, তাই এগুলির অভাব ঘটলে উদ্ভিদ শীর্ণ হয়ে পড়ে আর স্বাভাবিক ভাবেই ফলন কম হয়। মৌলিক উপাদানের অভাব ঘটলে উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ শক্তিও কমে যায় তাই উদ্ভিদ সহজেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় (তালিকা নং 3)।

** এক জমিতে আগের তুলনায় যথেষ্ট বেশী ফসল হওয়ায় গো-চারণ ভূমি হিসেবে ব্যবহার কমছে, আগে যে সব জমি পতিতই থাকত সাধারণভাবে তাও আর পতিত থাকছে না—তাদের নানান ব্যবহার (বনসৃজণ থেকে ঘর-বাড়ী বানানো অবধি) হচ্ছে। ফলে গোচারণভূমি কমার জন্য গরুও কমছে। এছাড়া খরচবহুল বিদেশী গরু পোষার ফলে অনেকেই বেশ কয়েকটির বদলে একটি বা দুটি গরু পুষছে। অনেকে তো গরু পোষা ছেড়েই দিয়েছে খরচার ভয়ে। ট্র্যাক্টর পশ্চিমবঙ্গের অনেক অংশেই সম্ভবত এখনও তেমন ভাবে ব্যবহার হচ্ছে না। ফলে ট্র্যাক্টর ব্যবহার বাড়ার সাথে গরু কমার সরাসরি সম্পর্কের কথা জোর দিয়ে বলা যায় কি ? [লেখাটি পাঠ করার সময় বি ও বি-তে আলোচনায় এই বক্তব্যটি ওঠে]

তালিকা নং 3

স্বল্পমাত্রিক মৌল	অভাবজনিত রোগ
মলিবডেনাম (Mo)	গাছের পাতার বৃদ্ধি কম হয়, নাইট্রোজেনের অভাব দেখা যায়।
বোরণ (B)	কান্ড দুর্বল হয়, ফলের আকার ছোট হয়, ডাল চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কান্ড ও মূলে পচন শুরু হয়।
দস্তা (Zn)	নতুন পাতা কুঁকড়ে যায়, ডালপালার সংখ্যা কমে। গাছ রুগ্ন হয়।
তামা (Cu)	পাতা হলদে হয়ে যায়, টমেটো গাছ নেতিয়ে পড়ে।

জৈব সার ব্যবহার কম হবার ফলে জমির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যেমন সছিদ্রতা, জল ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি পরিবর্তিত হচ্ছে। জৈব সারের স্বরূপ ব্যবহারের জন্যে জমির সছিদ্রতা বা আয়ন বিনিময় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং জমি অনুর্বর হয়ে পড়ছে। জৈব সার মাটিতে বসবাসকারি বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দেয়। এর মধ্যে বেশ কিছু ব্যাকটেরিয়া বাতাসের নাইট্রোজেনকে জমিতে আবদ্ধ করে। ফলে উদ্ভিদ সেই নাইট্রোজেন ব্যবহার করতে পারে। জৈব সার ব্যবহৃত না হলে জমিতে এই ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা অত্যন্ত কমে যায় এবং জমিতে নাইট্রোজেন কম আবদ্ধ হয়, তখন অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন ঘটিত সার ব্যবহার করতে হয়। তাই জৈব সারের ব্যবহার কমলে জমিতে রাসায়নিক সারের চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। কোনো জমিতে জৈব যৌগের পরিমাণ কমে যাবার পর তাতে অধিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করলে জমির জল ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কমে যায়। ফলে উদ্ভিদের কোষ-প্রাচীর পাতলা হয়ে যায় ও উদ্ভিদ সহজেই রোগাক্রান্ত হয়, এবং ফসলও বিস্বাদ হয়ে যায়। তাই দেখা গেছে যে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে এইচ ওয়াই ভি চাষ করলে প্রথম কয়েক বছর প্রচুর ফলন হবার পর হঠাৎ ফলন অত্যাধিক কমে যায়। হেক্টর প্রতি জমিতে ক্রমশ সারের চাহিদা বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত জমিটি চাষের অযোগ্য হয়ে যায়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে 50 এর দশকে প্রতি টন অতিরিক্ত সারে 11·5 টন ফসল উৎপন্ন হত, 60 এর দশকে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ দাঁড়াল 8·5 টন এবং 70 এর দশকে 5·8 টন মাত্র। পাঞ্জাবে বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের ফলে দস্তা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদির অভাব প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। হুগলীর বিভিন্ন গ্রামে আমরা দেখেছি জমিতে ক্রমাগতই বেশি পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হচ্ছে। পাওয়ার টিলারের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার জন্যে গ্রামগুলিতে গরু প্রায় নেই বললেই চলে। তাই গোবর সারের ব্যবহারও স্বাভাবিক ভাবেই প্রায় নেই। এর পরিনতিতে ক্রমশ জমিতে বেশি বেশি পরিমাণ জল ও সার ব্যবহার করতে হবে। এবং শেষ পর্যন্ত জমি চাষের প্রায় অযোগ্য হয়ে যাবে। তালিকা নং 4 তে পশ্চিমবঙ্গে 1963 থেকে 1980 পর্যন্ত সারের ব্যবহার কিভাবে বেড়েছে দেখান হল।

তালিকা নং 4

বছর	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
1962-63	13221	5801	3622
1963-64	18115	8087	6061
1964-65	19517	10585	8922

1965-66	32388	7488	8452
1966-67	26643	9174	11669
1967-68	29453	7824	7000
1968-69	31841	14193	7500
1969-70	33839	10899	10732
1970-71	46675	12392	37591
1971-72	55840	17500	21912
1972-73	52819	16412	23163
1973-74	54000	18400	25900
1974-75	85700	19400	20300
1975-76	86000	23800	19900
1976-77	98682	26761	23809
1977-78	113920	29089	29237
1978-79	146386	52975	43941
1979-80	144936	62895	32884

□ কালমেঘ মণ্ডল

---

* 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'কে ঠিক সময়ে উপযুক্ত বিষয়বস্তু সহ প্রকাশিত হতে সাহায্য করুন।

* লেখা পাঠান—'উন্নয়ণ' কে ঘিরে বিতর্ক বা পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রচনা—গণস্বাস্থ্য বা নিউক্লিয়ার শক্তি সব কিছুই বি ও বি সাদরে গ্রহণ করবে। বিশেষ অনুরোধ—স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক রিপোর্ট, অনুসন্ধান বা সমীক্ষার জন্য বি ও বিতে নিয়মিত বিভাগ রাখা হচ্ছে। এই বিভাগে লেখা পাঠান।

* গ্রাহক হোন, কাছের মানুষদের গ্রাহক হতে সাহায্য করুন। একটি ছোট্ট উদ্যোগকে বাঁচিয়ে রাখতে আপনার সহযোগিতা খুবই জরুরী।

* বি ও বি পাওয়া যাচ্ছে—বি বা দি বাগ—টেলিফোন ভবনের উল্টোদিকের কয়েকটি স্টল। উৎস মানুষ, বুক মার্ক ও রাসবিহারী—আশুতোষ মুখার্জী রোড জংশন, ডেকার্স লেন (দিলীপ মজুমদারের স্টল)।

শুখা মুক্তি অভিযান

'শুখা মুক্তি অভিযান'—এক অভিনব উদ্যোগ। সামিল হয়েছেন বিহারের পালামৌ জেলার শ'পাঁচেক গ্রামের মানুষজন। নিজেদের উদ্যোগে গড়ে তুলছেন ছোট ছোট বাঁধ তথা জলাধার। বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য। শুখা মরশুমে ব্যবহার করবেন।

ছোট বড় বেশ কিছু সংগঠন মিলে গড়ে উঠেছে 'পানি চেতনা মঞ্চ'। শুখা মুক্তি অভিযানে গ্রামের মানুষকে সামিল করা এদের উদ্দেশ্য। 'পানি চেতনা' এই শব্দ দুটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনেক কথা। জল কি জিনিস জানেন সকলে। বিশেষ করে গ্রামের মানুষ তো বটেই। এক কলসি পানীয় জল সংগ্রহ করতে তাদের অনেককেই ছুটতে হয় দূর দূরান্তে। এর ওপর বছর বছর 'শুখা' তো লেগেই আছে। তবু কেন পানি-চেতনা-মঞ্চ?

জল নিয়ে রাজনীতির ব্যাপারটা মানুষের জানা দরকার। মঞ্চের লোকজন মনে করছেন জল প্রকৃতির দান। সবার তাতে অধিকার। জল মিললে প্রকৃতির আশীর্বাদ। না মিললে অভিশাপ। এভাবেই জানে মানুষ। এই ভাবনা আজ অচল। প্রকৃতির দেওয়া জল আজ ক্ষমতাবানদের কুক্ষিগত। গ্রামের ওপর সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার। ফলে ক্ষমতা যার জল তার। সমাজের ক্ষমতার সিঁড়িতে যার যত নীচে অবস্থান জলের ওপর তার অধিকার তত কম। এই হল জল বন্টন নীতি বা জল-রাজনীতি। এই বিষয়টি জল চেতনা মঞ্চ বুঝিয়ে বলছেন সকলকে। এই মঞ্চে একত্র হয়েছেন যে সমস্ত সংগঠন তার মধ্যে আছে সর্বাঙ্গীন গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, এ. আই. ভি, ইপ্টা, ঔরাঙ্গা বাঁধ বিরোধী সংঘর্ষ সমিতি, জল চেতনা সভা, নারী মুক্তি বাহিনী, নয়া দিশা সংস্থা ইত্যাদি। বান্দোয়া, লাতেহার, গারু, লেস্‌লিগঞ্জ, ছত্তারপুর এবং ডাল্টনগঞ্জ—এই ছ'টি কেন্দ্র থেকে এরা কাজ করছেন।

পালামৌ জেলায় বৃষ্টিপাত কম হয় এমন নয়। দেশের আর পাঁচটা এলাকার মতই প্রায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ জমির প্রকৃতির কারণে বৃষ্টি ধোয়া জল বয়ে চলে যায় অন্যত্র। ধরে রাখার ব্যবস্থা নেই স্থানীয় ভাবে। বড় বাঁধের জল খাল কেটে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। সে জলে তাদের অধিকার নেই। তাই তাদের প্রশ্ন—এই জল কি তাদেরও নয়? তাদেরও কি চাষের জল দরকার নেই? তারাও কি কৃষক নন? তা'লে কেন জল পাবেন না তারা?

'প্রশ্নগুলো সহজ। উত্তরও তো জানা।' তবু উত্তর মেলে না। উত্তর দেবার কথা যাদের তারা নিরুত্তর। তাই নিজেদেরকেই উত্তরের সন্ধানে লাগতে হয়েছে। এরা নিজেদের অতীত পর্যালোচনা করে দেখেছেন গ্রামের মানুষ আগে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মেটাতে সচেষ্ট হতেন। অন্যের দ্বারস্থ হতেন না। শুখা দিনের জন্য জলাশয়। দুর্দিনের জন্য শস্য ভাণ্ডার। গ্রামোন্নয়নের জন্য অর্থ-ভাণ্ডার। এসব গ্রামের মানুষ নিজেরাই করতেন। সেসব উদ্যোগ আজ আর বড় বেশী দেখা যায় না। এজন্য দায়ী রাষ্ট্র নিজেই। সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে মানুষকে ক্ষমতাহীন এবং উদ্যমহীন করে তুলেছে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। সরকারের হয়ে ঠিকেদারের লোকেরাই সব কাজ করে। আর সকলে দর্শক। যে কাজ করে আর যাদের এলাকায় কাজ হয় সকলেরই মনোভাব—'ওটা সরকারের কাজ'। আর এই

উদাসীনতার ফাঁকে প্রশ্রয় পেয়ে বেড়ে উঠেছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ঠিকেদারী ব্যবস্থা নামক জোচ্চুরির কারবার। এমনিতে সরকারি আমলা-ইঞ্জিনীয়ার কর্মচারী পুষতেই ব্যয় হয় উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের বড় অংশ। বাকিটা যায় ঠিকেদারের গহ্বরে। গ্রামের মানুষ যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকেন।

এরা তাই ঠিক করেছেন পুরনো দিনের পরম্পরাটি ফিরিয়ে আনবেন। নিজেরাই উদ্যোগী হবেন স্থানীয় উন্নয়নের কাজে। এলাকার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ যাতে যথার্থ কাজে লাগে দেখবেন। এক কথায় গ্রামের মানুষ যাতে পরনির্ভরতা কমিয়ে নিজেরাই নিজেদের কাজে উদ্যোগী হতে পারেন সেজন্য সচেষ্ট হবেন। কাজটা সহজ নয়। একদিকে সরকারি প্রশাসনের স্বাভাবিক বাধা। অন্যদিকে নিজেদের দক্ষতার অভাব।

দুটি বাধাই এরা অবশেষে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের পরিকল্পনার রূপরেখাটি এই রকম। যেহেতু জলের সমস্যাটাই তাদের সব চেয়ে বড় সমস্যা তাই শুরুতে এর সমাধানেই উদ্যোগী হয়েছেন তারা। এজন্য গ্রাম থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন 'পানি পঞ্চায়েত'। এই পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানেই জল-সেচ পরিকল্পনা রূপায়িত হবে। 'পানি চেতনা মঞ্চ' মূলতঃ তাদের ধ্যান-ধারণা প্রচারের কাজ করবেন। শুধুমাত্র জল-প্রকল্পের মধ্যেই নিজেদের কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ রাখবেন না এরা। গ্রামের সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্যেই কাজ করবেন স্থির হয়েছে। এজন্য অর্থ এবং দক্ষতার প্রয়োজন। সেজন্য স্বেচ্ছা-শ্রম দিয়ে উপার্জিত অর্থে 'গ্রাম-কোষ' গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই 'গ্রাম-কোষ' ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছাদানে পুষ্ট হয়ে উঠেছে। আর গ্রামের মানুষদের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পানি চেতনা মঞ্চ বন্ধু সংগঠনের সহায়তায় তা কার্যে রূপায়িত করেছে। এপর্যন্ত চারশ'র বেশী গ্রামবাসী বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে পানী পঞ্চায়েতের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।

বাঁধ এবং জলাধার নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এরা সরকারি প্রশাসনের কাছ থেকেই আদায় করেছেন। কাজটি সহজ হয়নি। তবু পেরেছেন। কারণ তাদের সাংগঠনিক শক্তি এবং যুক্তিনিষ্ঠ প্রস্তাব কোনটাই জেলা প্রশাসনের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এদের দাবি ছিল তাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থটুকু যাতে যথার্থ কাজে ব্যয়িত হয় তা নিশ্চিত করা। এজন্য ঠিকেদারের প্রয়োজন নেই। তারা নিজেরাই মদত দেবেন। নজরদারির কাজ সরকারি ইঞ্জিনীয়ার বা প্রশাসনের হাতেই থাকবে। এই শর্তেই রাজি হয়েছেন জেলা প্রশাসন। বরাদ্দ টাকা পানি পঞ্চায়েতের নামে গচ্ছিত থাকবে ট্রেজারীতে। সরকারি ইঞ্জিনীয়ার কাজ তদারকি করে সন্তুষ্ট হলে পঞ্চায়েত ট্রেজারী থেকে টাকা তুলতে পারবে। মজুরী বন্টন এবং হিসেব দাখিলের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের। এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এবং এখনও পর্যন্ত মোটামুটি সুষ্ঠুভাবেই কাজ এগিয়ে চলেছে।

বাঁধ-জলাধার ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয়, ডিজাইন, কাজের ক্রমোপর্যায় নির্ধারণ, শ্রম-বন্টন, পারিশ্রমিকের হার নির্ণয়, হিসেব রাখার পদ্ধতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয় তারা দেরাদুনের গণবিজ্ঞান সংস্থা পিপলস সায়েন্স ইনস্টিটিউটের সহায়তায় স্থির করেছেন। গোটা পরিকল্পনাটি এই রকম। প্রাথমিক পর্বে 508টি গ্রামে এই প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলি মোটামুটি হরিজন এবং আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম। এজন্য প্রায় নয় লক্ষ শ্রম-দিবস প্রয়োজন হবে। কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে। এক একটি প্রকল্প মোটামুটি 21 একর এলাকার জল সেচের উপযোগী করে ডিজাইন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত যে হারে কাজ হচ্ছে তাতে অনুমান একর প্রতি সেচের খরচ হবে দশ হাজার টাকা। পরিমানটা সরকারী প্রকল্প খরচের অর্ধেক। পাশেই ঔরঙ্গা বাঁধ প্রকল্পে খরচ হচ্ছে একর প্রতি একুশ হাজার টাকা।

মজুরির বিষয়টি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই স্থির করেছেন তারা। কাজের পরিমান নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু বৈচিত্র এনেছেন। যেমন মাটি কাটা এবং স্থানান্তরণের ক্ষেত্রে ঘনফুট মাটির হিসেবের সাথে দূরত্বের বিষয়টিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবং মজুরি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য প্রকাশ্য

স্থানে লিখে টাঙিয়ে রাখা আছে। মাপ-জোক, কাজের হিসেব, মজুরীর হিসেব এসবই পানি পঞ্চায়েতের সদস্যরাই করছেন। যাদের মধ্যে গ্রামের শিক্ষিত যুবকরাও রয়েছেন। দিনের কাজের শেষে কাজের অগ্রগতি, বিভিন্ন খাতে ব্যয়িত অর্থ ইত্যাদির হিসেব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ্য স্থানে টাঙানোর ব্যবস্থা রয়েছে। সমস্ত হিসেবপত্র যথাসম্ভব স্বচ্ছ রাখা হচ্ছে। যাতে প্রয়োজন বোধে যেকোন সদস্যরা এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন।

এই কাজ ঘিরে গ্রামের মানুষদের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। গায়ে খেটেই খায় এরা। কিন্তু এতখানি দায়িত্ব নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা নতুন। পানি পঞ্চায়েতের সদস্যদের আত্মবিশ্বাস খুবই প্রবল এখন। ওদের কথায়—'এ তো সবে শুরু। আগামী দিনে আরও দায়িত্বপূর্ণ কাজ আমরা করতে পারব আশা রাখি।' □

★ আমাদের বন্ধু মেঘনাথ এই 'অভিযানের' একজন সক্রিয় কর্মী। সম্প্রতি এসেছিল কলকাতায়। ওর কাছ থেকেই শোনা এই বিবরণ। প্রতিবেদন তৈরী করেছে রবীন চক্রবর্তী। পানী চেতনা মঞ্চের সাথে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ পানি চেতনা মঞ্চ, এস. পি. কোঠি রোড, আবাদগঞ্জ, ডাল্টনগঞ্জ, জেলা—পালামৌ, বিহার।

একটি আবেদন

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকার 1994 সালের চারটি সংখ্যা একত্রে পাওয়া যাচ্ছে। মূল্য ঃ 20 টাকা (ডাক খরচ সহ)। 1995 সালের জন্য গ্রাহক হোন।

গ্রাহক চাঁদা ঃ ব্যক্তি—বার্ষিক 16 টাকা (ডাক যোগে 20 টাকা)

□ বিশেষ ক্ষেত্রে 10 টাকা (ডাক যোগে 14 টাকা)

প্রতিষ্ঠান ঃ বার্ষিক 50 টাকা (ডাক খরচ সহ)

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার বার্ষিক সদস্য চাঁদা ঃ 25 টাকা (বিশেষ ক্ষেত্রে 15 টাকা)

□ সদস্যরা গ্রাহক চাঁদা ছাড়াই পত্রিকা পাবেন।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফট বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। কুপনের নীচে স্পষ্টভাবে নাম-ঠিকানা লিখবেন।

□ পুরনো বি ও বি-র সংখ্যার জন্য যোগাযোগের ঠিকানায় লিখুন।

বিষয়ঃ পরিবেশ

পাঁচ

দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার উর্দ্ধে পরিবেশ কোন বিমূর্ত বিষয় নয়। মানুষের সৃষ্টি-স্থিতি-কৃতি সবই পরিবেশ-নির্ভর। লয়ও বোধহয় পরিবেশ-ধ্বংসে। সমাজ-সংস্কৃতি-জীবিকা সবকিছুই আজ পরিবেশ দূষণের প্রচ্ছায়া-উপচ্ছায়া কবলিত।

বিজ্ঞান-কারিগরি পরিবেশ দূষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। দূষণ-রোধেও বিজ্ঞান-কারিগরিকেই হাতিয়ার হয়ে উঠতে হবে ঠিকই, কিন্তু পরিবেশ-মুখী মানবিক একটি দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে তা সম্ভব হবে না বলেই মনে হয়। এমনই এক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসন্ধানের উদ্যোগ বিষয়ঃ পরিবেশ।

যে কেউ এই বিভাগে প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। মনোনীত লেখা পরিকল্পনা মাফিক যথাস্থানে প্রকাশিত হবে। কম বেশী দেড় হাজার শব্দের মধ্যে লেখা পাঠান। চিঠিপত্রে মতামত জানান। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর খবর, টিকা, সমীক্ষাও গৃহীত হবে। —সঃ মঃ

পরিবেশ দূষণের আরও রকম-সকম ও ক্ষয়ক্ষতি

(তৃতীয় অংশ)

এক যে ছিলো ডোডো—
উড়তে-মানা পক্ষী ছিলো আর ছিলো সে বৃক্ষ ;
মাংসলোভী মানুষগুলোর লুব্ধ ফাঁদে
লুপ্ত হলো পক্ষী ডোডো,
বাঁচলো শেষে বৃক্ষ।

এক যে ছিলো বন—
লক্ষ কোটি জীবের আবাস,
মত্ত মানুষ দর্পভরে করলো তাকে নাশ
বিলোপ হলো বন্য জীবের
করলো মরু গ্রাস!

এক যে ছিলো নদী—
বন-জঙ্গল পাহাড় ফুঁড়ে
বইতো নিরবধি।
ধাত্রী সে যে সভ্যতার
ক্লান্ত আজি ছন্দ তার
নষ্ট গতি দুষ্ট ধারা, নদী তো নয়, নালা!
ভয় দেখানো বন্ধ করে ভাগ দেখি তুই, পালা!

বি ও বি-তে তোমার লেখাগুলো বড্ড একপেশে হয়ে যাচ্ছে—ভূমিকা না করেই আক্রমণ করে বসলেন গগনদা।

—একপেশে মানে ?—আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারি না।

—একপেশে মানে একপেশে! আরে বাবা, মূল ব্যাপারটা তো পরিবেশের বিনাশ, বিকৃতি; খারাপ পরিবর্তনও বলতে পারো। শিল্প-দূষণ তার একটামাত্র দিক, গুরুত্বপূর্ণ দিক নিশ্চয়ই কিন্তু সেটাই সব নয়। তোমার লেখাগুলো পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে অন্য অনেকের মতো তুমিও শুধু কলকারখানার দূষণকেই পরিবেশের ক্ষতির একমাত্র কারণ হিসেবে তুলে ধরছ। ঘোষণামত এবার তো তুমি পরিবেশ দূষণের রকম-সকম ও ক্ষয়ক্ষতি' প্রসঙ্গ শেষ করে অন্য প্রসঙ্গে, আলোচনায় যাবে, তাই না? খানিকটা বিস্ময় নিয়ে বলেই

ফেলি—আপনি এতো খুঁটিয়ে পড়ছেন নাকি? লেখক আর প্রুফ-রীডার ছাড়া আর কারও ওগুলো পড়বার তাগিদ হয় বলে আমি ভাবিনি!

শুধু শিল্পই দূষণ ঘটায় না

—সে কেউ পড়ুক না পড়ুক, লিখছ যখন তখন তো যথাসম্ভব কম্প্রিহেনসিভ হবার চেষ্টা করবে! এই যে হাসপাতাল-নার্সিং হোম-স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রতিদিন টন টন আবর্জনা যত্রতত্র ফেলা হচ্ছে—রক্ত মাংস-পুঁজ সহ—বর্জ্য আলোচনা প্রসঙ্গে তার উল্লেখমাত্র দেখলাম না তো তোমার লেখায়! অথচ এও এক মারাত্মক দূষণ। কলকাতায় তো এগুলো সাধারণ আবর্জনার সঙ্গেই মিশে থাকছে—কাকে কুকুরে টানাটানি করে ছড়িয়ে দিচ্ছে, বৃষ্টিতে ধুয়ে ছড়িয়ে পড়ছে; গরীব মানুষরা সেগুলো হাতড়ে বেড়াচ্ছে, শ্রমিকরা লরি ভর্তি করে ধাপায় নিয়ে ফেলছে, সেখানেও শয়ে শয়ে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ভাবো তো একবার ব্যাপারখানা! কত রকমের রোগ-জীবাণুই না এগুলোর মারফৎ মাটিতে জলে বাতাসে অনবরত মিশছে!

—জীবাণু-দূষণ নিয়ে আমি তো এখনও কোন আলোচনা করিনি, তাই……

আমি সাফাই গাইবার চেষ্টা করি।

গগনদা আমাকে প্রায় উপেক্ষা করেই বলতে থাকেন—'স্বাস্থ্য-আবর্জনার' কথাটা নেহাৎই এসে পড়ল বলে উল্লেখ করলাম। কিন্তু তুমি কি অন্যান্যভাবে জীবাণু সংক্রমণ—যেমন যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে জীবাণুদের প্রজনন ও লালন করা, মাত্রাহীনভাবে বাড়তে দেওয়া, শত্রুর দেশে পরিকল্পিতভাবে মহামারী সৃষ্টি করা—ইত্যাদি কথাও ভবিষ্যতে আলোচনার জন্য তুলে রেখেছ? আর শুধু জীবাণুই বা কেন কীট-পতঙ্গ প্রাণীদেরও যে যুদ্ধের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা এবং তার ফলে প্রজাতিবিশেষের ধ্বংস বা বিলোপ হবার সম্ভাবনার কথাও কি তোমার মাথায় আছে? মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি, সখ-আমোদ, বিলাস-অভ্যাস-খেলা-ফূর্তি-স্ট্যাটাসের-শিকার কত পশু পাখি তার হিসাব কি তোমরা জানো? এমনকি বিজ্ঞানীরা 'পরীক্ষার' নামে যে কত পশু পাখি খুন করছে প্রতিদিন—আর কি নিষ্ঠুর যে সেইসব 'পরীক্ষা' তার হদিস কি তোমরা রাখো? কত প্রাণী কত উদ্ভিদ যে তাদের স্বাভাবিক—আবাস থেকে উৎখাত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে, হচ্ছে এবং হতে চলেছে তার কিছু কিছু সাংখ্যিক হিসেব মাঝে মধ্যে খবরের কাগজে টাগজে ছোট্ট করে বেরোয়……

—মানুষও তো ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে—আমি এতক্ষণে বলার চেষ্টা করি।

—হ্যাঁ, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষও উচ্ছেদ হচ্ছে, বিলুপ্তও হচ্ছে

—গগনদা আত্মমগ্ন—আর তা হ'চ্ছে মানুষেরই কল্যাণের নামে, প্রগতির নামে। জীব ও উদ্ভিদ প্রজাতির বিলোপ না ঠেকাতে পারলে মানুষ তার প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার, রসদের উৎসটাকেই যে নষ্ট করে নিজেরই অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনছে সে বোধ এখনও তেমন ব্যাপকতা লাভ করে নি। জৈববৈচিত্র্য তথা বায়োডাইভার্সিটি সুরক্ষা নিয়ে সৌখিন আলোচনার পাশাপাশি চলে ভিনদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন, পশু-পাখির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চামড়া পালকের চোরাকারবার।

—কিন্তু সে তো আর এক মহাভারত, দূষণ প্রসঙ্গে এসব আলোচনা করতে গেলে……

—দূষণের 'শুদ্ধতা' বজায় থাকে না, তাই না?—গগনদা বিদ্রূপ করে ওঠেন। তোমাদের মতে চাষাবাদ, কৃষি, সার-কীটনাশক-সেচ-বাঁধ-জলাধার এসবেরও নিশ্চয় দূষণের সঙ্গে ততটুকুই যোগ, যতটুকু যোগ এগুলোর সঙ্গে শিল্পোৎপাদনের—তাই না? মহামারী-খরা-বন্যা-মরুভূমির প্রসার এসবই তোমরা হয়তো নিছক প্রাকৃতিক দুর্যোগ—বিপর্যয় হিসেবেই দেখো। খেয়াল থাকে না যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষ তথাকথিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়-গুলোকেও ডেকে আনছে এবং এগুলো সবই পরিবেশকে নষ্ট করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া, মোটেই বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এগুলোকে আড়াল করে শুধু শিল্প-দূষণের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করলে সেটা হয় নিতান্তই একপেশে।

ভেতরে ভেতরে আমি আমার জানার অসম্পূর্ণতা, দৃষ্টিভঙ্গীর খন্ডতা স্বীকার করতে বাধ্য হই;

কিন্তু মুখে আশ্রয় নিই এক চালাকির —আসলে এসব বিষয়ে আমি লেখার যোগ্য নই—আপনিই কিছু লিখুন না !

লেখার ব্যাপারে গগনদা চিরকেলে কুঁড়ে। তিনি এবার এড়াতে চান—তুমি কি আর থিসিস লিখবে ? ভুরি ভুরি সংখ্যা, ভারী ভারী রেফারেন্স দেবার তো দরকার নেই। আর সেভাবে তুমি লিখছও না। পরে এক সময় কিছু আকরগ্রন্থের নাম দিয়ে দিতে পারো। আর আমি একথাও বলছি না যে শিল্পদূষণ সমস্যায় ফোকাস করতে চাইলে সেটা কোন দোষের ব্যাপার হবে। তবে একটা সামগ্রিক পটভূমির ভিত্তিতে আলোচনাটা হওয়াই কাম্য—এটাই আমার বক্তব্য।

গগনদাকে বেকারদায় পেয়ে গিয়ে আমি নাছোড়বান্দার মতই লেখার জন্য বলতে থাকি। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি একটা মধ্যপন্থায় রাজী হলেন—বেশ, আমি যে প্রসঙ্গগুলো তুলেছি সেগুলোর মধ্যে কয়েকটিকে বেছে নিয়ে তুমি প্রশ্ন করো, আমি যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

বিপন্ন জৈবপ্রজাতি

সোৎসাহে আমি প্রথম প্রশ্ন পেশ করি—আচ্ছা, এ পর্যন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ মিলিয়ে মোট কত রকমের জৈবপ্রজাতির হদিস জানা গেছে ? অজানার পরিধিই বা কেমন ? কত প্রজাতি ধ্বংস বা লুপ্ত হয়েছে, কতই বা ধ্বংসোন্মুখ ?

—ব্যস্ ব্যস্, একটার মধ্যে এতগুলো গুঁজে দিও না।···সত্যি বলতে তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা নেই। প্রাথমিক কিছু কথা বলা যায় মাত্র। এ পর্যন্ত জানা জৈব প্রজাতির মোট সংখ্যা খুব সুনির্দিষ্ট নয়, তবে প্রাণী উদ্ভিদ মিলিয়ে পনেরো থেকে কুড়ি লক্ষ প্রজাতির অস্তিত্বের কথা মোটামুটি নিশ্চিত। এ সংখ্যা অবশ্য খালি চোখে দেখা যায় এমন সব প্রজাতির। এদের মধ্যে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ হ'ল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ও পতঙ্গ। শুধুমাত্র মশারই অন্তত তিন হাজার প্রজাতি জানা আছে। অবশ্য তাদের অধিকাংশই মানুষের পক্ষে তেমন ক্ষতিকারক নয়।···বিশ্বব্রহ্মান্ডে সংখ্যার বিচারে খালি চোখে অদৃশ্য জীবাণুদেরই প্রাধান্য। সমস্ত প্রকার জৈব প্রজাতির তারাই হ'ল তিন চতুর্থাংশ। আবার ঐ 15-20 লক্ষ দৃশ্যমান প্রজাতির ব্যাপারেও সকলে একমত নন। অনেকের মতে সংখ্যাটা অনেক বেশীই হবে; সব মিলিয়ে আনুমানিক এক কোটিও হ'তে পারে বা তারও বহুগুণ বেশী !···গত প্রায় শ'তিনেক বছর ধরে বিলুপ্ত জৈব প্রজাতির কিছু হদিস জানা আছে। মোটামুটি 500 প্রাণী-প্রজাতি এর মধ্যে বিলুপ্তির কবলে পড়েছে, বিলুপ্ত উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা 10000, মোটের উপর। কারও কারও মতে এখন প্রায় 20 000 জৈবপ্রজাতি বিপন্ন অর্থাৎ বিলুপ্তির পথে। যদিও অনেকেই অনুমান করেন যে মোট জানা প্রজাতির শতকরা কুড়ি ভাগই বিপন্ন !

—বিলুপ্তি বা বিপন্নতার কারণ কি ? একটু ব্যাখ্যা করবেন ?

—উত্তর দেবার আগে একটা বিশেষ ব্যাপার বলে নিই। প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে অজানা অতীতেও অনেক জৈব প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। আবার পরিবর্তিত প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে প্রয়োজনীয় জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন রূপে টিঁকেও থেকেছে অনেক জীব। প্রাকৃতিক নির্বাচনে অবলুপ্তি ও উত্তরণ দুটোই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সে অবলুপ্তিতে অনেক দীর্ঘ সময় লেগেছে এবং মোটের উপর জৈববৈচিত্র্য কিন্তু বেড়েই গেছে। কিন্তু এখন জৈববৈচিত্র্য অনেক দ্রুত কমছে, কোন কোন প্রজাতি অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিলুপ্তির কবলে পড়ছে।···জৈব প্রজাতির অবলুপ্তি আগেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে ; আগের তুলনায় বিলুপ্তির সাংখ্যিক হার বাড়ছে বা সময় কম লাগছে কারণ বিবর্তন এখন দ্রুততর—এমন কুযুক্তিও দেবার চেষ্টা হয়ে থাকে। কিন্তু এটা যে ত্বরান্বিত—বিবর্তন নয়, বিবর্তনের প্রক্রিয়া ও ছন্দ নষ্ট হওয়া—ত্বরান্বিত বিপর্যয়—সে সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার।

বিপন্নতার পন্থা-প্রকরণ

চোরা শিকারী, পাচারকারী, ব্যবহারকারী—এবং এই পটভূমিতে মানুষের ঘটানো জৈব প্রজাতির অবলুপ্তির ক্লাসিক উদাহরণ হিসেবে

ডোডো পাখীর কথা বলা যায়। মরিশাস দ্বীপের এই বিশালকায় উড়তে না পারা পাখীর শেষতমটি শিকারীর হাতে মারা পড়ে 1680 সালে। এবং আশ্চর্য, স্থানীয় মানুষ যে গাছকে ডোডো গাছ বলে জানতো, তারও আর কোন নতুন চারা গজায় নি প্রায় তিনশো বছর ধরে। 1973 সালে যখন ডঃ স্ট্যানলে টেম্পল মরিশাসে পেঁছিলেন তখন আর মাত্র তেরোটি 'ডোডো' গাছ বেঁচে ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই বয়স প্রায় তিনশো বছর! অনেক চিন্তা-ভাবনা-পরীক্ষা ও নিরীক্ষার পর ডঃ টেম্পল সিদ্ধান্তে এলেন যে ডোডো গাছের ফল যেহেতু ডোডো পাখির প্রিয় খাদ্য ছিল, নতুন কোন ডোডো গাছের চারা জন্মানোর সঙ্গে ডোডো পাখির গভীর কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব। হয়তো পাখির পেটে ফলের মধ্যের শক্ত বীজের খোসায় এমন কোন পরিবর্তন হতো যাতে বীজের অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব হ'তো পাখির মলের মধ্যের বীজ থেকে। কয়েকটি টার্কি পাখিকে ডোডো গাছের ফল খাওয়ালেন ডঃ টেম্পল। এবং তাদের মলের মধ্যের বীজ থেকে তিনটি চারা তৈরীতে সক্ষম হ'লেন।...মরিশাস এবং তার সঙ্গী আরো দুটি দ্বীপে অনেক পাখি ও উদ্ভিদের বিলুপ্তি ঘটেছে, সম্ভবত প্রজাতি অবলুপ্তির ঘণত্ব সারা পৃথিবীতে এই দ্বীপপুঞ্জেতেই সবচেয়ে বেশী।

—উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিকতার এ এক চমৎকার উদাহরণ। হ্যাঁ, এবং কিছু ক্ষেত্রে একের অবলুপ্তি অন্যেরও অবলুপ্তিই ঘটিয়েছে—ডোডো গাছের মত সবাইকে বাঁচানো যায়নি।

—আপনি জৈব প্রজাতি বিলুপ্তির কারণ বলছিলেন, আমি খেই ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করি।

—হ্যাঁ, মনে আছে। ...আজ হাতি গন্ডার গরিলা বাঘ বাইসন হরিণ—এইসব বড় বড় প্রাণীদেরও প্রজাতি-বিশেষ লোপ পাবার মুখে। সংরক্ষণের কিছু কিছু কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু সুফল মিলেছে এই মাত্র কিন্তু বিলুপ্তির কারণগুলো শুধু অব্যাহতই নয়, অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি আরও জোরদার হয়েছে। ...বন্য প্রাণী নিয়ে মানুষের কীর্তির কথা জাঁ ডোমাল্যাঁর স্বীকারোক্তি থেকেই শোনা ভালো। 1975 সালে জাঁ ইভে ডোমাল্যাঁর লেখা আত্মজীবনী-মূলক একটি বই বেরোয়—'দি অ্যানিম্যাল কানেকশন ঃ দি কনফেশনস অফ অ্যান এক্স ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল ট্রাফিকার'। চতুর ও করিতকর্মা ডোমাল্যাঁর জন্মভূমি ফ্রান্স ছেড়ে ইন্দোচীনে গিয়ে কারবার ফাঁদেন। তাঁর চটকদার প্যাডে জ্বলজ্বল করতো 'ডঃ অফ ন্যাচারাল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটারিনারি সার্জারি' ডিগ্রী এবং হেড অফ লাওস বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার, হেড অফ ভিয়েনতিয়েন মিউনিসিপ্যাল জু—এইসব গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকার! বলা বাহুল্য, না ছিল তাঁর গবেষণা-মূলক ডিগ্রী, না ছিল ঐসব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব। লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদির নম্বরও ছাপা থাকত প্যাডে, যদিও সবই ছিল ভুয়ো। তবে তার প্যাডে একটি তথ্য সঠিক থাকতো—ব্যাঙ্ক অফ ইন্দোচায়নার একটি অ্যাকাউন্ট নম্বর। এ সবের জোরে ডোমাল্যাঁর ব্যবসা চুটিয়ে চলতে থাকে। বন্য প্রাণী সরবরাহ করতেন তিনি মূলত বিভিন্ন দেশের চিড়িয়াখানায় এবং সার্কাসে। ডোমাল্যাঁর স্পষ্টভাবেই বলেছেন—জীবন্ত বন্য-প্রাণীর কারবারীরা কোথাওই সাধারণ প্রাণী নিয়ে চিন্তিত নয়। তাদের ব্যবসার শতকরা নব্বই ভাগই বিরল ও নিষিদ্ধ প্রাণীকে নিয়ে। আইন-কানুন, কর ফাঁকির বহুবিধ কৌশল প্রয়োগ করে তারা। বাক্স বা খাঁচার সামনের দিকে ছাড়-পাওয়া প্রাণী থাকলেও, ভেতরের দিকে থাকে নিষিদ্ধ প্রাণী। জ্যান্ত সাপ বা হিংস্র বনবেড়াল দেখে কে আর ভেতরে খুঁজে দেখার ঝুঁকি নেবে? বাদামী বা ছাই রঙের লোমশ প্রাণীকে পার-অক্সাইড দিয়ে সাদা করে কিংবা পশু পাখিকে অন্যরকম রঙীন করে সেগুলোকে দুর্লভ প্রজাতি বলে একশো থেকে একহাজার গুণ দাম হাঁকা তো মামুলি ব্যাপার, যেসব প্রাণী বন্দীদশায়ও ভালোই বাচ্চা দিতে পারে, তাদের প্রতিটি পুরুষকে বন্ধ্যা করে দেওয়া হ'তে পারে জাহাজে তোলার আগে। দুটি পাটাতনের মাঝে থেঁতলে অন্ডকোষ গুঁড়িয়ে দিয়ে বা উচ্চমাত্রার আলট্রাভায়োলেট রশ্মি প্রয়োগে কাজ হাসিল হয় চমৎকার, কিন্তু চট্ করে ধরা পড়ে না। ডোমাল্যাঁর কিন্তু বেশ ভালোভাবেই

জানতেন যে শতকরা আশিটি প্রাণীই হয় পথেই মারা পড়বে নয় গন্তব্যে পেঁছিনোর কয়েকমাসের মধ্যেই, তাই অগ্রিম দাম পাবার ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে তাঁরা ভুলতেন না।

—সেকি, তবে যে শুনি জ্যান্ত বন্যপ্রাণীর কারবার নিয়ন্ত্রণের জন্য কত কত আন্তর্জাতিক সংগঠন আছে? আমার মুখ দিয়ে প্রশ্ন বেরিয়ে যায়।

—ঠিকই, ওয়াল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড এর অধীনেই আছে 'ট্রাফিক' (TRAFFIC-Trade Record Analysis of Flora and Fauna in Commerce) নামের আন্তর্জাতিক সংগঠন। 1973-এ তৈরী হয়েছে আর একটি সংগঠন—'সাইট্স্' (CITES-Convention On International Trade in Endangered Species) এবং এরা বেশ তৎপরও। কিন্তু ব্যাপার কি জানো, মানুষের সখ-আহ্লাদ অভ্যাস ইত্যাদির সামাজিক রেওয়াজগুলো যতদিন না র‍্যাশনাল হ'চ্ছে এই লুকোচুরি বন্ধ করা দুষ্কর। এই তো 1992তে-'ট্রাফিক' কাঠমান্ডুর দোকানে দোকানে ঘুরে 294টি বাঘ নেকড়ে চিতা ইত্যাদির চামড়ার কোট প্রকাশ্যে ঝোলানো দেখতে পায়—অভিজাত সৌখিন ক্রেতা ধরবার জন্য। কাঠমান্ডু একটা করিডর যেখান দিয়ে এই উপমহাদেশ থেকে বহু নিষিদ্ধ জিনিষ পাচার বা আমদানি হয়। দিল্লীর সদর বাজারের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বন্যপ্রাণী দপ্তর ও পুলিশ গত দু' দশক ধরে বত্রিশ হাজার পশু চামড়া বাজেয়াপ্ত করলেও চোর পুলিশ সবাই বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছে। 1977এ জার্মানীর একজন মাত্র ডিলারই ব্রাজিল থেকে 75000 এবং প্যারাগুয়ে থেকে 400,000 পশু চামড়া আমদানি করেছিল—বেশীর ভাগই বাঘ জাতীয় প্রাণীর।···আর কী বিচিত্রই না মানুষের সখ-আহ্লাদ-আভিজাত্যের প্রকাশ! গ্রীক ধনকুবের অ্যারিস্টটল ওনাসিস—হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো, নিহত আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিধবাকে বিয়ে করে তিনি হয়েছিলেন আরও বিখ্যাত—তাঁর প্রমোদতরী ক্রিস্টিনার বারে বসবার টুল হিসেবে থাকতো পুরুষ তিমির লম্বা লিঙ্গচ্ছেদ। তিমির মাংসও জাপানের অঞ্চলবিশেষে রীতিমত দুর্লভ সুখাদ্য! গন্ডারের খড়গের পাউডার যৌনশক্তিবর্ধক হিসেবে চীনে সমাদৃত, একশৃঙ্গ এশীয় গন্ডারের খড়্গ হলে কার্যকারিতা নাকি আরও বেশী। বছর তিরিশ আগে এরকম এক একটি খড়গের দাম ছিল চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার ডলার! দক্ষিণ ইয়েমেনে আভিজাত্যের প্রতীক ছিল গন্ডারের খড়্গ দিয়ে তৈরী বাঁটযুক্ত ছোরা। আগে শুধু সম্ভ্রান্ত ও ধনী অল্প-সংখ্যকই সেটা জোগাড় করতে পারতো। এখন পেট্রোডলারের প্রসাদে চাহিদা অনেক বেশী, দামও। এক-একটা খড়্গ পিছু 25-30 হাজার ডলার।···হাতির দাঁতের কদর তো পৃথিবীব্যাপী, কিন্তু দাঁতাল হাতি দুর্লভ। কাজেই তাদের টেঁকা মুস্কিল। এ এক দুষ্টচক্র—যত বিরল—তত দুর্লভ—তত দামি—তত বিপন্ন। আর যত দামি, যত বিপন্ন, ততই বিধিনিষেধের বেড়া, তত হোমড়া চোমরারা ব্যবসাতে লিপ্ত, মায় রাষ্ট্র প্রধান পর্যন্ত। উগান্ডার একদা রাষ্ট্র-প্রধান ইদি আমিনের শুধু কুমিরের 'সেনা' বাহিনীই ছিল না, বন্য পশু শিকারের জবরদস্ত বাহিনীও ছিল!

—কিছু কিছু বন্য পশু-পাখিকে পুষে মানুষ তাদের বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচিয়েও তো দিয়েছে।

আমার মন্তব্যে গগনদা একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর ব্যথাভরা দৃষ্টি মেলে বললেন—সেরকম দৃষ্টান্ত বিরল। তোমাদের মত শিক্ষিত মানুষরাও জানে না যে বন্য পশুপাখি পুষে মানুষ বিলুপ্তিই ঘটায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। সখের মালিকরা বহু দাম দিয়ে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে দুর্লভ ভিনদেশী প্রাণীকে জোগাড় করলেও শতকরা পঁচানব্বই জনেরই থাকে না তাদের ঠিকমত লালন পালনের ন্যূনতম জ্ঞান। নিজেদের স্বাভাবিক পরিবেশ-চ্যুত এইসব প্রাণী পোষ্যদশায় শতকরা পাঁচটিও দু-এক বছরের বেশী বাঁচেনা। কুকুর, ঘোড়া, সরীসৃপ, পাখী সবার ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। আরও দুঃখের ব্যাপার হ'লো গৃহপালিত পশু-পাখীর কারবারীরা পোষা প্রাণী চুরি করে বার বার বিক্রি তো করেই, তাদের কৃত্রিম প্রজননের সময় জিনবিকৃতি ঘটিয়ে দুর্লভদর্শন নভেল্টি তৈরীতে সদা সচেষ্ট যাতে দাম বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব প্রাণী জীবনসংগ্রামে

কমজোরী হয়ে যায়। জ্যাক লন্ডনের 'কল অফ দি ওয়াইল্ড' বই তো বেশ সুবিদিতই। কুকুরের উপর মানুষের নিষ্ঠুরতার এ এক দলিল।···এই শতকের গোড়ায় ব্রিটেনে ভূমধ্যসাগরীয় কচ্ছপ পোষার হিড়িক পড়ে গেছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছরে আশি লক্ষ কচ্ছপ বিক্রি হয় শুধু ব্রিটেনেই। অবশেষে আশির দশকে এই কচ্ছপের ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হয়।

পাখির কারবার আরও চমকপ্রদ। ব্রিটিশ এনভায়রনমেন্টাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি 1988-তে এক সমীক্ষায় দেখায় যে প্রতিবছর একমাত্র সেনেগাল থেকেই এক কোটি পাখি রপ্তানী করা হয়ে থাকে। উদ্যোগ আয়োজনে মারা পড়ে আরও অন্তত এক কোটি। বিরল প্রজাতির পাখির ছানা, ডিম, পালক সবই অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসার উপাদান। ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ—তখন তিনি ছিলেন শুধু ডিউক অফ ইয়র্ক—নিউজিল্যাণ্ডে গেছিলেন এই শতাব্দীর একেবারে গোড়ায়। মাওরি উপজাতির এক প্রধান তাঁকে উপহার দেয় একটি সুদৃশ্য পাখির পালক—লম্বা কালো পালকের শীর্ষে সাদা টিপ। এটি ছিল বিরল পাখি হুইয়ার। ব্রিটেনে অবিলম্বে সেটি এক ফ্যাশনে পরিণত হল। দলে দলে হুইয়া মারা পড়তে লাগল শিকারীর হাতে। অবিশ্বাস্য লাভ। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে দশ বছর যেতে না যেতেই হুইয়ার বংশ ধ্বংস হ'ল। এরকম রোমহর্ষক বহু কাহিনী ছড়িয়ে আছে মানুষের 'কীর্তি'-র ইতিহাসে। সেসব সত্যিই মহাভারত। তবে আর একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয়। আঁকড আর ক্যাকটাস নিয়ে দস্যুতা রাহাজানি আজও অব্যাহত। বিপন্ন উদ্ভিদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে বেশী হবে ক্যাকটাস আর আঁকড়ের প্রজাতির সংখ্যা। এমনিতেই বিশেষ বিশেষ ভৌগলিক অঞ্চলে বিশেষ প্রজাতির এইসব উদ্ভিদ জন্মায়। ভিনদেশে এদের চাহিদা ও দাম লোভনীয়। দস্যুতাও মাত্রাছাড়া। 1979-তে একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী একলক্ষ ক্যাকটাস রপ্তানী করেছিল।

এবং বিজ্ঞানী

ভুলেই গেছিলাম আমার প্রশ্ন করার কথা। গগনদা থামতেই আমি সম্বিত ফিরে পাই—আচ্ছা বন্য প্রাণীদের উপর বিজ্ঞানীদের নিপীড়নের কথা কি যে আপনি বলছিলেন ?

—হ্যাঁ পশুপাখী নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণাও সর্বদা তাদের ভালোর জন্য নয় এবং পদ্ধতিও সমর্থনযোগ্য নয়। মানুষের ব্যবহার্য ওষুধ, কীটনাশক, প্রসাধন ইত্যাদির বিষ-ক্ষমতার মাত্রা নির্ধারণের জন্য যেসব পরীক্ষা করা হয় তাদের মধ্যে অন্যতম একটির সংক্ষিপ্ত নাম এল ডি ফিফটি (LD50)। এতে একসঙ্গে কুড়ি-তিরিশ-পঞ্চাশ-একশো সংখ্যার একগুচ্ছ প্রাণীর উপর ক্রমান্বয়ে বেশী বেশী মাত্রায় পদার্থটি প্রয়োগ করা হয়। যে মাত্রায় শতকরা পঞ্চাশভাগ পরীক্ষাধীন প্রাণীটি মারা পড়ে সেটিই হল ঐ পদার্থটির এল ডি ফিফটি। ইঁদুর, গিনিপিগ, খরগোস বিড়াল, বাঁদর বিভিন্ন প্রাণী ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে। যেমন ধরো পাউডার, নেলপালিশ বা ঐ জাতীয় প্রসাধনী কতটা নিরাপদ তা দেখার জন্য বেচারা খরগোসদের খাঁচায় গলা আটকে পা টেনে ধরে চোখে বস্তুটি প্রয়োগ করা হয়। নির্দিষ্ট সময় ধরে নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করার পর তিন সপ্তাহ ধরে তাদের চোখের ক্ষতি নিরীক্ষণ করা হয়—ফুলছে, না ঘা হ'চ্ছে, না অন্ধত্ব এসে যাচ্ছে ইত্যাদি। খরগোসদের অপরাধ যে ওদের চোখে জল তৈরী হয় না, তাই বস্তুটি ধুয়ে যেতে পারে না এবং ওদের চোখ খুবই সংবেদশীল !···সত্তরের দশকে একবার হিসেব করে দেখা হয়েছিল যে কেবলমাত্র ইংলণ্ডেই বছরে গড়ে চল্লিশলক্ষ প্রাণী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বলি হয়। মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নামে বানরশিশু বা শিম্পাঞ্জীশিশুকে বন্ধ খাঁচায় এককভাবে দীর্ঘদিন রেখে কি ফল হয় বা একটানা শব্দ, বিপজ্জনক গতি ইত্যাদির প্রভাবে কতটা ভীতি, উৎকণ্ঠা, নিরাপত্তাহীনতাবোধ ইত্যাদি মনোবিকার তৈরী হয় সেসবের পরীক্ষা'য় প্রাণীদের উপর কম অত্যাচার হয় না। আবার অন্যদিকে পুলিশ-মিলিটারির তরফে এসব পরীক্ষা থেকে জানার চেষ্টা হয় শত্রু বা বন্দী মানুষের উপর কতটা নির্যাতন কিভাবে আইন বাঁচিয়ে করা যায়, তথ্য বা স্বীকারোক্তি বের করার জন্য।

আমি আবারও প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, গগনদা নিরস্ত করলেন—

—আজ আর নয় অনেক হয়েছে।

তবু জোর করে বলেই ফেলি— আমাদের দেশের নানারকম ধানের, সবজির, ফসলের বিলুপ্তি প্রসঙ্গে কিছু বলবেন না ?

—না, এটা আর একটা বৃহৎ ব্যাপার। কৃষি প্রসঙ্গে বরং আলোচনা করা উচিত। আর সেভাবে দেখতে গেলে পরিবেশে বিভিন্ন দূষণের জন্য কিভাবে গোটা ইকোলজিটাই পাল্টে গিয়ে বহু জীবপ্রজাতির অবলুপ্তির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে সেটাও তো বলতে হয়। ডিডিটি'র প্রভাবে যে সামুদ্রিক উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ ক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছে এটা জানার পর সামুদ্রিক জীববিন্যাসে গুরুতর পরিবর্তনের আশংকা দেখা দিয়েছে। কিন্তু এসবই পৃথকভাবে আলোচনার যোগ্য।

□ রবীন মজুমদার

(প্রথম পর্ব সমাপ্ত)

আগ্রহী পাঠকদের জন্য কয়েকটি উৎসগ্রন্থ :

1. Hunter, Robert : The Greenpeace chronicle (Picador, 1980)
2. Weir, David : The Bhopal Syndrome (Earthscan, London, 1987)
3. Goldsmith, E Hildyard, N : The Earth Report (Mitchel, London, 1988)
4. Day, David : The Ecowars (Paladia, 1991)
5. Centre for Science and Environment ; The State of India's Environment (N. Delhi, 1985)
6. মোহিত রায় (সম্পাঃ) প্রসঙ্গ পরিবেশ (অনুষ্টুপ, 1991)

গত 21 জানুয়ারী, 1995 রাজধানী দিল্লীর বুকে টাইমস বিল্ডিং-এর সামনে জড়ো হয়েছিলেন দুশরও বেশী মানুষ যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। নারী আন্দোলনের ডাকে তাঁরা এসেছিলেন 'টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকা ও তার মালিক বেনেট, কোলস্যান অ্যান্ড কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে, কারণ আরও কয়েকটি গোষ্ঠীর সাথে যৌথভাবে এরাই আয়োজন করছিল এক সৌন্দর্য (?) প্রতিযোগিতার, যার নাম ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া। তাঁদের এই প্রতিবাদ ছিল টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকার বিরুদ্ধেও। কারণ নারী সৌন্দর্যকে বিজ্ঞাপিত করার নামে যেভাবে এই পত্রিকারা নারী শরীরকে এক বিশেষ ধরণের ভোগ্যপণ্য হিসেবে প্রচার করে তা নারীদের কাছে মারাত্মক রকম অপমানজনক ও ক্ষতিকর। এ প্রসঙ্গে নারী সংগঠনগুলির বক্তব্য আগামী সংখ্যায় বি ও বি-র পাতায় প্রকাশ করার প্রয়াস নেওয়া হবে।

[দিল্লীর নাগরিক মহামারী যাঁচ সমিতি প্রকাশিত প্লেগ রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত]

'প্লেগ মহামারী' (!)র চালচিত্র—

একটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন

প্লেগ চিত্র ঃ চার

এবারের প্লেগ মহামারী এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা ঃ

বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে প্রিভেন্টিভ্ এ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন বিভাগ এবং তাদের বিশেষজ্ঞরা থাকা সত্ত্বেও এবারের প্লেগ মহামারীর সময় 'মহামারী প্রতিরোধ এবং জনস্বাস্থ্য' বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ মতামত পাওয়া গেল না—কেন ? আমাদের সাথে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞরা বা চিকিৎসকেরা কথা বলেছেন তারাও গোপনীয়তা রক্ষা করে মুখ খুলেছেন ! এই-ই বা কেন ? দিল্লী মেডিকেল কলেজের একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার 3. 10. 94 তারিখে সমিতির সদস্যদের সাথে (গোপনীয়তা রক্ষা করে) কথা বলার সময় জানান যে সমস্ত প্লেগ রোগীদের যে কোন জায়গায় একটু আলাদা ভাবে রেখে চিকিৎসা করা যেত, তাদের *আই ডি এইচেই পাঠাতে হবে এমন কোন প্রয়োজন ছিল না—তিনি আরও জানান 2. 10. 94 এবং 3. 10. 94'তে দিল্লী সরকারের অধীনে পোলিও ভ্যাক্সিন খাওয়ানোর সময় চার হাজারেরও বেশী লোক এক জায়গায় জমায়েত হওয়াতে প্লেগ আরও ছড়িয়ে পড়েছিল ।

সমিতি সিটি গভর্নমেন্ট হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি বিভাগের একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে 3 অক্টোবর দেখা করে। তিনি প্লেগ সন্দেহে ধরে আনা ব্যক্তিদের দেখাশোনা করছিলেন ।—সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের এখানে কিছুক্ষণ রেখে আই ডি হাসপাতালে ভ্যানে করে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। তিনি জানান যে কোন হাসপাতালেই এই চিকিৎসা করা যায়। সমিতি প্রশ্ন করে কেন মেডিকেল কলেজগুলি এই চিকিৎসা করছেনা। তিনি অত্যন্ত গোপন ভাবে জানান সু-ব্যবস্থার অভাব যেমন মুখোশ, টুপি, গাউন ইত্যাদির অভাবই না কি এর কারণ !

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং সেই সঙ্গে দিল্লী মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন উভয়েই এই ব্যাপারে চুপচাপ ছিল নয়ত চিরাচরিত ধারণার বশবর্তী হয়ে ছিল। কেউই এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কোন বিজ্ঞান সম্মত জনস্বাস্থ্য নীতির উপস্থাপনা করতে পারেনি ।

এন আই সি ডি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভূমিকা ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) প্লেগ ম্যানুয়ালে প্লেগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে রোগীকে আলাদা করে রাখার কথা স্বীকার করা হয়েছে। তবে রোগীর নিজের বাড়ীতেই এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলা হয়েছে। কারণ রোগীকে, চিকিৎসার সু-ব্যবস্থা থাকলেও, আনা-নেওয়াকে এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। রোগী হাঁটাচলা করতে গেলে হঠাৎ মারা যেতে পারে একথাও বলা হয়েছে ।

এন আই সি ডি পরিষ্কার কোন নির্দেশ রাখতে পারেনি বলে যে সমস্ত চিকিৎসা বিভ্রাট দেখা দিয়েছিল সেগুলি হলো—

(1) শুধুমাত্র চিকিৎসার গাফিলতিতে নয়, নিওমোনিক প্লেগ রোগীর পথেই মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছিল ।

(2) যেহেতু অ্যাম্বুলেন্সগুলিতে একসাথে বহুরোগী আনা নেওয়া হচ্ছিল, যাদের রোগ ধরেনি তাদেরও

★ আই ডি এইচ—ইনফেকশাস ডিজিনেস হসপিট্যাল

রোগীর সাথে থাকার জন্য রোগ ধরে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে যাচ্ছিল।

শাসন ব্যবস্থা যখন রোগীদের একমাত্র আইসিডি এইচেই রাখার কথা ভাবছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তখন সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছে। তবুও 'হু' এর প্রধান কর্তা যখন 'সুষ্ঠু' প্লেগ মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাও কে অভিনন্দন জানান তখন এর যুক্তিহীনতা আমাদের অবাক করে।

প্রতিষেধক-এর ভূমিকা ঃ

জনস্বাস্থ্যের সাথে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি জানেন প্লেগের সংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রতিষেধক ওষুধের কোন ভূমিকা ছিলনা। বিষয়টি যদিও এন আই সি ডি-র প্রচার পত্রিকায় ছিল তবুও যথা সময়ে এই বিষয়ে সে কিছুই বলেনি। সংবাদপত্রের মাধ্যমে যখন সাধারণ মানুষ প্রতিষেধক ওষুধের দাবী তোলে তখনই শুধু এই কথা বলা হয়েছিল। এন আই সি ডি তাদের পত্রিকায় আরও জানিয়েছিল যে যারা প্লেগ রোগের মোকাবিলায় নামবে তাদের গবেষনাগারের কাজে দক্ষ হতে হবে। কারণ প্লেগের ব্যাকটেরিয়ার উপর বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে করে দেখতে হবে কোনটি ঠিকমত প্রতিরোধ করতে পারছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল রক্ত পরীক্ষা করে প্লেগ-জীবাণু আছে কি নেই এইটুকুই শুধু দেখা হচ্ছে। রোগ শুরু হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে কোন ওষুধের নাম জানা নেই অথচ আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে এটি করা উচিত ছিল। যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকেরা প্লেগ নিয়ে গবেষণা করছেন এবং যখন প্লেগের জীবাণু সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন কিছুই জানা যায়নি তখন নিউদিল্লীর ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ কে কে আগরওয়াল বলে দিলেন অক্সিটেট্রাসাইক্লিন হচ্ছে প্লেগের সেরা ওষুধ। যদি ডাক্তারী পড়ুয়া কোন ছাত্র এই মন্তব্য করত তাহলে নিশ্চয়ই তাকে দু-এক বছর নীচের ক্লাসে নামিয়ে দেওয়া হতো। একটি ওষুধকে 'সঠিক' বিবেচনা করার পিছনে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার। আসল ঘটনা কয়েকদিন পর জানা গেল। দিল্লীর পাঁচতারা হোটেল, 'ডিল্যাক্স হোটেল হলিডে ইন্'-এ একটি মিটিং ডাকেন ডাঃ আগরওয়াল 9 অক্টোবর। টাকা দেয় ফাইজার কোম্পানী। চারশত ডাক্তার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রচুর খাওয়াদাওয়া করে তাঁরা প্লেগ নিয়ে আলোচনায় বসেন। ডাক্তাররা একে অপরকে অযথা ভয় ছড়াতে বারণ করেন। এবং সেই দিনই ফাইজার বাজারে একটি নতুন 'টেট্রাসাইক্লিন' চালু করে—নাটক এখানেই !

জনস্বার্থ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে বর্তমান চিকিৎসা-ব্যবস্থা অচল ঃ

প্লেগ মহামারীর সময়ে সুরাট থেকে সরকারি ডাক্তাররা যখন দলে দলে পালাতে থাকেন তখন ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা হাসির খোরাক হয়ে ওঠে—সারা বিশ্বে। এইসব ডাক্তারদের আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যেত কিন্তু তা করা হয়নি। সুরাটের মানুষ প্রচন্ড ঘৃনায় ও রাগে এদের 'একঘরে' করেছিলেন। —গুজরাটের মেডিকেল কাউন্সিল নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। যদিও কাউন্সিলের উচিত ছিল কর্তব্যে অবহেলার দায়ে এইসব ডাক্তারদের চিহ্নিত করা এবং ব্যবস্থা নেওয়া।

এই বিষয়ে একটা পুরনো অভিজ্ঞতা ঝালিয়ে নেওয়া যাক। জরুরী অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধী জোর করে নির্বীর্যকরণের জন্য ডাক্তারদের অনেক ক্ষমতা দিয়েছিলেন, এবং এই খুনী ডাক্তারদের নাম মেডিকেল কাউন্সিল থেকে বাদ দেওয়া হয়নি ! বেশীর ভাগই পরবর্তীকালে পুরস্কার পেয়েছিলেন 'জাতির সেবায়' বুদ্ধিমত্তা দেখানোর জন্য। অবিবাহিত ব্যক্তিদের জোর করে নির্বীর্যকরণ করতে যিনি আপত্তি করেছিলেন তাকে বদলি করা হয়েছিল আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে—শাস্তি হিসাবে ; কারণ তিনি শাসকদলের নীতিকে অবহেলা করেছিলেন।

এই ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের কি দেবে ?

সংকলন ও অনুবাদ—শর্মিলা

নয়া অর্থনীতি ঃ পুরনো চিত্র

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

'নয়া অর্থনীতি'। কথাটা আর নতুন নেই। রেডিও, টিভি, খবরের কাগজের দৌলতে সবাই জানেন — বোঝেনও। 'দেশী বিদেশী যেই হও যেমন খুশি ব্যবসা করে কামিয়ে নাও।' এরই নাম নয়া অর্থনীতি। এরই বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত আমাদের সরকার।

এমন বন্দোবস্ত নতুন নয়। আগেই চালু হয়ে গেছে আরও ডজন খানেক দেশে। এক আধটু হেরফের করে। আফ্রিকায়, লাতিন আমেরিকায়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়। যাদের অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বলে চেনে সকলে, তাদের দ্রুত উন্নত এবং আধুনিক করতে এই উদ্যোগ।

এই বন্দোবস্তের রূপরেখা তারা নিজেরা বানিয়েছেন এমন না। তৈরী হয়েছে ওয়াল্ড' ব্যাংক—আই এম এফ দপ্তরে। এরা সকলে ওয়াল্ড' ব্যাংক—আই এম এফের কাছে ঋণী। হাজার হাজার কোটি ডলারের ঋণ। এত ঋণ যে ঋণ শুধতে ঋণ করতে হচ্ছে। ফলে ডুবে মরার অবস্থা। এই সমস্যা থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছে সেই ওয়াল্ড' ব্যাংক—আই এম এফ-ই। অনেক ভেবে-চিন্তে (!) বাতলেছেন দাওয়াই। যার নানান রকমফেরে নাম 'নয়া অর্থনীতি'। যে নীতির একটাই লক্ষ্য। তাবৎ বাধা নিষেধের বেড়া ভেঙ্গে বহুজাতিক সংস্থাদের ওইসব দেশের বাজারে ঢুকিয়ে দেওয়া!

অন্যান্য দেশে এই দাওয়াই অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে গেছে আগেই। আমাদের দেশে একটু দেরীতে। বহুল প্রচারিত সমাজ-তন্ত্রের হোর্ডিং-ব্যানারগুলো গোছগাছ করে তুলে রেখে কাজে নামতে একটু দেরী হয়ে গেছে।

নয়া অর্থনীতির আচমকা ধাক্কায় কমবেশী সকলেই হতচকিত। 'কি হয় কি হয়' আর 'কিছু একটা হবেই' এই দুই ভাবনার প্রান্তে দোদুল্যমান অনেকের আস্থা। তবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুবিধেজনক অবস্থানে রয়েছেন এমন সকলেই এর মধ্যে বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখছেন। বলছেন আখেরে ভালই হবে। অর্থনীতিতে গতি আসবে। কেউ কেউ মানতে পারছেন না এ কথা।

আসলে দুটো দিকই আছে। ভালো এবং মন্দ। কারো ভালো। কারো মন্দ। কার ভাল কার মন্দ প্রশ্ন সেটাই। পকেটে রেস্ত থাকলে সব বন্দোবস্তই ভালো। নতুন এই ব্যবস্থা আরো ভালো। রোজগার এবং খরচের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা রইল না। রইল না ভোগ বিলাসে বাধা। দেশী বিদেশী সেরা জিনিসটি মিলবে হাতের কাছে। বিনা আয়াসে। বাধা হবে না বিদেশী মুদ্রা। প্রয়োজনে মানুষের মুখের গ্রাস কেড়েও আসবে বিদেশী মুদ্রা। আর পকেট যাদের ফাঁকা অসুবিধে তাদেরই। তাদের জন্য কিছু করা যাচ্ছে না। নয়া অর্থনীতি নাচার। তবে ভাবখানা যেন—"পারলে এরই মধ্যে লড়াই করে টিকে থাকো।' নইলে চুলোয় যাও। দেশের-স্বার্থ' (!) বড় আগে ?'

খবরের কাগজে পকেটে-রেস্ত-ওয়ালাদের জন্যই খবর থাকে বেশী। যেমন, টাকা কত অল্প সময়ে কয়েক-গুণ করা যাবে। কোন্ ট্যাক্সো ছাড় হল। কোন মডেলের গাড়ীটি এবারে বাজারে আসছে। কোন

বিখ্যাত বিদেশী নিলাম-কোম্পানি এবার ভারতে আসছে। ফ্যাশন মডেলিং কত আবর্ষণীয় পেশা। ইত্যাদি। অন্য দিকে উল্টো খবরও থাকে। কিসের ভর্তুকি উঠবে এবার। কোন কারখানা নিলাম হবে। কত চাষী জমি বেচে শহরমুখী হলেন। ইত্যাদি।

জমি বেচার খবর নিয়েই শুরু করা যাক। সম্প্রতি স্টেটসম্যান পত্রিকায় এই মর্মে একটি প্রতিবেদন বেরিয়েছে। লিখেছেন শ্রী মানস ঘোষ। বীজ, সার, জলের দাম আচমকা বেড়ে যাওয়ায় ছোট চাষীরা দিশেহারা। বেশী সুদে টাকা নিয়ে চাষ করলে লাভ থাকে না। ফলে জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

নয়া অর্থনীতির মূল কথা হল লেনদেনের কারবারে দান খয়রাতির জায়গা নেই। চলবে না ভর্তুকির আবদার। বাজার মানে বাজার। সেখানে আপন-পর গরীব-বড়লোক সবাই সমান। কেনা-বেচা বাজার দরেই করতে হবে। বাজারের এই আপাত নিরপেক্ষতার মহিমায় গরীব কারবারিদের জেরবার অবস্থা। পালিয়ে বাঁচা ছাড়া উপায় নেই। হুগলী জেলার হরেন মন্ডল এদের একজন। ছোট এক খন্ড জমির দৌলতে কৃষি-উৎপাদক ছিলেন। নয়া বাজারনীতির প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারলেন না। জমি ছেড়ে দিলেন। হরেন মন্ডল এখন ক্ষেত মজুর।

উপরোক্ত এই প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে গত দু'বছরে ছোট ছোট জমি হস্তান্তরের ঘটনা ব্যাপক হারে বেড়েছে। এই পশ্চিমবঙ্গে। জবরদস্তি কেউ কেড়ে নেয়নি জমি। স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিচ্ছেন। চাষের খরচ জোগাতে না পেরে। এদের অনেকেই এই জমি পেয়েছিলেন ভূমি সংস্কারের দৌলতে। এমন লক্ষ লক্ষ জমি সম্প্রতি হাত বদল হয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গে!

জমিগুলো নিচ্ছেন যারা স্বভাবতঃই পকেটে তাদের রেস্ত আছে। চড়া দামে সার-বীজ-জল কিনতে পারবেন। তাই এক খন্ড জমি জোগাড় করতে পারলে আশ-পাশের আরও জমি হাতিয়ে নিচ্ছেন। লোভ দেখিয়ে। বড় জমিতে চাষ করছেন। ফলন বেশী হচ্ছে। বাড়ছে লাভ।

গত দু'বছরে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদনে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এমন কি ব্যয়বহুল বোরো চাষের ক্ষেত্রেও। বেড়েছে মোট উৎপাদন। কৃষি উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান এখন পাঞ্জাবের পরেই। আগামী মরশুমে পাঞ্জাবকে ছাড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। মানসবাবুর অনুমান।

এই দুটি ঘটনা এক করে দেখতে হবে। একদিকে লক্ষ লক্ষ চাষী জমি ছেড়ে দিচ্ছেন। চাষের খরচ যোগাতে না পেরে। অন্যদিকে পুঁজি নিয়ে এগিয়ে আসছেন গ্রাম শহরতলীর অন্য লোক। এই উঠতি বড়লোকদের কাছে আইন-কানুন বাধা নয়। ভূমি সংস্কারে হাত বদল হওয়া জমি পুনর্বার হাত বদল করাতে অসুবিধে হচ্ছে না।

সরকারও এদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভূমি সংস্কার আইন বদল হতে চলেছে। জমির ব্যবহার সংক্রান্ত বিধি নিষেধের বেড়া উঠিয়ে দিতে। জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ হোক চাইছেন সরকার। শুধু দেশী নয়, বিদেশী পুঁজিও। আগ্রহীরা অপেক্ষমান। কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়তে চান তারা। এ অবস্থায় গরীব চাষীদের জমি থেকে সরে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় কি? এটাই নিয়ম!

আমরা বঙ্কিমবাবুর "বঙ্গদেশের কৃষক" পড়ে পরাণ মন্ডলের কাহিনী জেনেছিলাম। কিভাবে সে জমি ছাড়া হয়েছিল। জমিদার ও তার সাগরেদদের অত্যাচারে। মানসবাবু জানিয়েছেন সিঙ্গুরের হরেন মন্ডলের কাহিনী। দু'বিঘে জমির মালিক হরেন। ভূমি সংস্কারের দৌলতে। চাষের খরচ জোগাতে পারেননি গত বছর। জমিটা ইজারা দিয়েছেন স্থানীয় এক মাস্টার মশায়ের কাছে। চার মাসের জন্য। বিঘে প্রতি পাঁচশ টাকায়। উপরি হিসেবে চাষের সময় জমিতে কাজ পাবেন। দৈনিক চব্বিশ টাকা।

হরেনের মত জমি নিয়ে যারা চাষ করছেন তাদের আয়ের একটা হিসেব পাওয়া গেল। বিঘে প্রতি ছয় থেকে দশ হাজার! সত্যি মিথ্যে জানিনা। শোনা কথা। মানসবাবু শুনেই লিখেছেন।

টাকা থাকলে টাকা খাটালে টাকা

আসবে। জানা কথা। তবে এতদিন যেমন খুশি যেখানে খুশি টাকা খাটানোয় কিছু কিছু অসুবিধে ছিল। সে অসুবিধে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ফলে পুঁজি এখন স্বাভাবিক প্রবণতায় ঢুকে পড়বে সর্বত্র। ন্যায়-নীতি উচিত-অনুচিত বাছবিচার ছাড়াই।

হরেন মণ্ডলের জমি এখন হাত বদল হয়ে গেছে গ্রামেরই মাস্টার মশায়ের কাছে। এরপর যাবে বড় পুঁজির মালিকদের হাতে। কৃষি-ভিত্তিক শিল্প হবে। বহুজাতিক সংস্থার 'সহযোগিতায়'। শব্দটি লক্ষনীয়—'সহযোগিতায়'। এই 'সহ-যোগিতা'র মাধ্যমে গড়ে উঠবে রপ্তানী-নির্ভর শিল্প। মাঠের ফলন কারখানা ঘুরে কৌটো-বন্দী হয়ে চালান যাবে বিদেশে। স্বাভাবিকভাবেই এজন্য চাই উচ্চ মানের ফলণ। বীজ সার ইত্যাদি আসবে বিদেশী কোম্পানী থেকে। কিন্তু জল? উচ্চ ফলনশীল চাষের জন্য চাই অঢেল জল। এদের পয়সার অভাব নেই। বড় বড় পাম্প বসবে। জল আসবে মাটির তলা নিংড়ে। মাটির নীচের জলের ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। ইতিমধ্যেই হাওড়া হুগলী বর্ধমানের বহু জায়গায় বছরে তিন চার মাস জল মেলে না। শ্যালো-ডীপ কোন পাম্পেই। মাটির নীচে জলপৃষ্ঠ ক্রমেই নেমে চলেছে। এক সময় শুকিয়ে আসবে অবশিষ্ট ভাণ্ডারটুকুও। বিশাল এলাকা জুড়ে মাটি শুকিয়ে খট্‌খটে চেহারা নেবে। বহুজাতিক সংস্থা তো পাত্‌তাড়ি গোটাবে তখন। উঠে যাবে অন্য কোন সুজলা-সুফলা দেশে 'সহযোগিতা'র হাত বাড়াতে! আমাদের জন্য এখানে পড়ে থাকবে শুখা মাঠ।

এটা কল্প-কাহিনী নয়। এ ঘটনা একের পর এক ঘটেছে আফ্রিকায়, লাতিন আমেরিকায়। যেখানে বিশ্বের তাবড়' অ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রীজ'দের ভীড়। স্বাচ্ছন্দ্যের হাতছানি দিয়ে কেড়ে নিয়েছে জমি। তারপর মুখের গ্রাস। এখন বছর বছর খরা সেখানে। খাদ্য আসে বিদেশ থেকে!

আগেই বলেছি ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিতের বালাই নেই।—পুঁজি খাটতে পারলেই সার্থক। তেমন খাটতে পাওয়ার নতুন নতুন সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে প্রতিদিন। তেমন একটি সম্ভাবনা মদের কারবার। সংবাদ পত্রের খবর—এদেশে মদের কারবারে এখন রমরমা অবস্থা। বিশ্বের বাজারে যদিও মন্দা চলছে। বৃদ্ধির হার মোটে আধ শতাংশ। কিন্তু এই পোড়া দেশে বৃদ্ধির হার নাকি পনের শতাংশ! অবিশ্বাস্য রকম উচ্চ হার! ফলে বিশ্বের তাবড় তাবড় মদের কারবারিরা 'সহযোগিতা'র হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের দিকে। কমপক্ষে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বাজার! হাত গুটিয়ে থাকা যায়? প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতায় এবং টিভির পর্দার চোখ জুড়ানো বিজ্ঞাপন-গুলো দেখলেই বোঝা যায় হাত গুটিয়ে নেই তারা।

মদের বাজারের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ির বাজার। শোনা যায় ভবিষ্যৎ এতই উজ্জ্বল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী, কোরিয়া ইত্যাদি দেশের তাবড় তাবড় 'অটোমোবাইল মেজর'রা হন্যে হয়ে উঠেছে এদেশের গাড়ির ব্যবসায় ঢুকতে। শোনা যাচ্ছে আগামী কিছুকালের মধ্যে সারা বিশ্বের জনপ্রিয় ষোলটি মডেলের গাড়ি দিল্লী বোম্বাই কলকাতার রাস্তায় দেখা যাবে!

• ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান এই শতকের শেষ পর্বে এদেশে গাড়ির ব্যবহার এখনকার চারগুণ হবে। টাকার হিসেবে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার গাড়ির বাজার পঁচিশ হাজার কোটিতে দাঁড়াবে। বৃদ্ধির হার আগামী দুবছরে পনের শতাংশ এবং আটানব্বইয়ের পরে তেত্রিশ শতাংশ হওয়া অসম্ভব নয়!

দুনিয়াজুড়ে গাড়ীর বাজারে মন্দা চলছে। নানান কারণে। তবে একটি কারণ সম্ভবতঃ পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা। অটোমোবাইলের ধোঁয়া পরিবেশের এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত আজ। মানুষ তাই চিন্তিত। স্বাভাবিকভাবেই গাড়ির কারবারিরাও। ফলে তারা এখন নির্বিঘ্নে-ব্যবসার এলাকা খুঁজে বেড়াচ্ছে। 'সহযোগিতার হাত' নিয়ে। সুযোগ বুঝে এগিয়ে আসছে আমাদের মত দেশের দিকে। শোনা যায় পৃথিবীর মধ্যে দিল্লী শহরে গাড়ি বৃদ্ধির হার সব থেকে বেশী! এয়ার কণ্ডিশনড্ গাড়ির আরাম ভোগ করবেন গাড়ির মালিক। আর পলিউশনের বোঝা বইবেন পথচারী!

সম্প্রতি একটি খবরে আমাদের গাড়ি-প্রীতির অপূর্ব নজির চোখে পড়ল। কিছুদিন ধরেই বিদেশী মডেলের একটি গাড়ির বিজ্ঞাপন বের হচ্ছিল কাগজে। অগ্রিম বুকিং-এর জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে। শেষ তারিখ অতিক্রম করার পর খবরে প্রকাশ প্রায় লাখখানেক দরখাস্ত জমা পড়েছে। কিমাশ্চর্যম্! "এখনো তারে চোখে দেখিনি / শুধু 'ছবি' দেখেছি"—তাতেই এই! গাড়িটি এখনও কারখানার চত্বর পেরিয়ে বাইরের আলো দেখেনি!

প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকাতেই নতুন একটি পাতা সংযোজিত হয়েছে সম্প্রতি। ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত। যেমন স্টেটসম্যান পত্রিকার 'বিজনেস অ্যান্ড ফিনান্স'। ওই পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে জনৈক পাঠকের এই প্রসঙ্গে একটি চিঠি প্রণিধানযোগ্য। পত্রলেখক সম্পাদককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নতুন এই বিভাগটি শুরু করার জন্য। তবে একটাই অভিযোগ তার। শেয়ারের দরগুলো ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ছাপা হয়। পড়তে বড়ই অসুবিধে।

পাতাটি খুলে দেখলাম—সত্যিই তাই। আর একটু বড় হলে ভালো হতো। শোনা যাচ্ছে অফিস-কাছারি-স্কুল-কলেজের অল্পবয়েসী কর্মচারী-শিক্ষকদের মধ্যে শেয়ার-বাজার নিয়ে আগ্রহ দারুণভাবে বাড়ছে। সম্পাদক মশাই সম্ভবতঃ তথাকথিত এই 'চক্ষুষ্মান' জনতার কথা মনে রেখেই হরফ এমন ছোট করেছেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে যারা, তাদের কি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই? একটু দেখবেন কি সম্পাদক মশাই ব্যাপারটা? 'নয়া অর্থনীতি'র স্বার্থেই।

□ রবীন চক্রবর্ত্তী

গ্রামকে বদ্‌লে শহর বানানো উন্নয়ণের এক প্রধান লক্ষণ বলে প্রশাসক-চিন্তাবিদরা অনেকেই মনে করেন। তারই এক বহিঃপ্রকাশ হল নতুন নতুন এলাকাকে মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত করা। অন্যদিকে মেগাসিটি, রাজারহাটে 'নতুন কলকাতা', ইত্যাদি বিশাল বিশাল কর্মকান্ডও খবরের কাগজের প্রথম পাতায় জায়গা নিচ্ছে।

এ হল উন্নয়ন রথের জয়যাত্রা! অন্যদিকে ভুক্তভোগী নাগরিকরা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করছেন শহর-জীবনের নানান বিষাক্ত সমস্যা।

এই বিষয় নিয়ে আমরা সবাই চিন্তিত। কারণ এসবের ফল আমাদেরই ভোগ করতে হবে। তাই 'বি ও বি' চায় এ নিয়ে মতামত গড়ে উঠুক, সর্বদিক নিয়ে সুস্থ চিন্তা করেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে নগরায়ণ নিয়ে 'বি ও বি'তে লেখা পাঠান। আপনার রচনা সাদরে গৃহীত হবে।

নির্মাণ-ঠিকাদারি-নয়-ছয়

নর্মদায় যা চলছে

নর্মদা নদীর ওপর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সর্দার সরোবর ও অন্যান্য যে সব বাঁধ তৈরী হতে চলেছে তা কাদের জন্য লাভজনক ? সরকার অবশ্যই বলে যে মূলত গুজরাট এবং পাশাপাশি দু একটি রাজ্যের (যেমন হয়ত রাজস্থান) জলহীন মানুষকে জল যোগান দেওয়াই এই বিশাল পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। যদিও কর্তারা কখনই এটা পরিষ্কার করেন না যে কতটা জল এবং 'জল ব্যবহার করে তৈরী' বিদ্যুৎ তাঁরা সাধারণ মানুষকে দেবেন, কতটাই বা ঢেলে দেবেন শক্তিক্ষুধার্ত ইন্ডাষ্ট্রিদের। সাধারণ মানুষ কিন্তু বিভ্রান্ত হন (তাই গুজরাটের বেশ কিছু মানুষই মনে করেন সর্দার সরোবর প্রকল্প হল গুজরাটের স্বপ্ন) মিথ্যে প্রচারে। তাঁরা জানতে পারেন না দৈত্যের মত এই প্রকল্পে সবচেয়ে লাভ কাদের। কাদের আগ্রহে হাজার হাজার আদিবাসী মানুষের সমগ্র জীবনকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, টাকা দিয়ে যার হিসেব করা যায় না এরকম বনাঞ্চলের পর বনাঞ্চল ধ্বংস করে, শত প্রতিবাদ প্রতিরোধের ওপর স্টীম-রোলার চালিয়ে এই 'উন্নয়নের নামে ধ্বংসকার্য'কে' অব্যাহত রাখা হয়।

সত্যিই তো আমরা কতটুকু জানি সেইসব ঠিকাদার-আমলা-রাজনীতিকদের সম্বন্ধে, প্রকল্পের কন্ট্রাক্ট-কমিশন-কিকব্যাকের টাকায় যাদের সিন্দুক ভর্তি হয়ে উঠছে, যাদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী এই বিনাশমুখি প্রকল্পকে আগে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ায়।

এ প্রসঙ্গে জানা গেছে জয়প্রকাশ ইন্ডাষ্ট্রিজের নাম। নর্মদা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সর্দার সরোবর ও ইন্দিরা সাগর দু জায়গাতেই কাজের ঠিকাদারি পেয়েছিল এই ব্যবসায়ী সংস্থা। এই দুটি প্রকল্পে বিভিন্ন কাজে টাকার পরিমাণ সর্দার সরোবর কংক্রীট ড্যাম—500 কোটি টাকা, ইন্দিরা সাগর কংক্রীট ড্যাম—250 কোটি, সর্দার সরোবর বড়গাও ড্যাম —35 কোটি টাকা, সর্দার সরোবর ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ কেন্দ্র—65 কোটি টাকা। এত বড় দুটি প্রকল্পে ঠিকাদারি পাওয়ার পর জয়প্রকাশ ইন্ডাষ্ট্রিজ হিমাচল প্রদেশে নাপথা ঝাকরি বিদ্যুৎ প্রকল্প (475 কোটি টাকা) এবং বাসপা বিদ্যুৎ প্রকল্পে 500 কোটি টাকার ঠিকাদারি পায়। এছাড়াও এদের উত্তরপ্রদেশে 400 মেগাওয়াটের বিষ্ণুপ্রয়াগ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (1000 কোটি টাকা) এবং হিমাচলের 300 মেগাওয়াটের চামেরা—2 প্রকল্পের (976 কোটি টাকা) ঠিকাদারি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণে কাজ শুরু হওয়া সর্দার সরোবর প্রকল্পের কাজ পাওয়ার পর একের পর এক নতুন নতুন প্রকল্পের ঠিকাদারি পায় এই কোম্পানি। কিন্তু সিধে রাস্তায় চলে সৎ ভাবে টাকা রোজগার করা তো এদের কাছে সোনা দিয়ে পাথর-বাটি বানানোর মতই অসম্ভব কাজ। তাই এরা জুয়াচুরি করে শেয়ার-মার্কেটে নিজেদের শেয়ারের দাম কৃত্রিমভাবে বাড়ায়। ফলে স্টক এক্সচেঞ্জের কালো খাতায় জয়প্রকাশ ইন্ডাষ্ট্রিজ-এর নাম উঠে যায়। এর ফলে শেয়ার বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে 1993 সালে শেয়ার কেলেঙ্কারিতে

সরকারিভাবে 193 কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে এমনটা দেখায় কোম্পানি। পাশাপাশি ইরাকে আরম্ভ করা প্রকল্পে কাজ শেষ না হওয়ায় সংস্থার টাকা আটকে যায়। এবং সর্দার সরোবর ও নর্মদা প্রকল্পের অন্যান্য কাজ নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের চাপে পিছিয়ে যায়। (প্রসঙ্গত অনেকেই জানেন যে উৎখাত হওয়া মানুষের পুনর্বাসন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় এবং অন্যান্য কারণে অর্থের এক প্রধান যোগানদার বিশ্বব্যাঙ্কও পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়)।

এখন নাকি কোম্পানিকে ঋণের জন্য বছরে সুদ দিতে হচ্ছে 100 কোটি টাকা! 1976 সালে হৃষিকেশের কাছে একটা বাঁধ তৈরীর সময় থেকে জয়প্রকাশ ইন্ডাস্ট্রিজ হোটেল ব্যবসাতেও হাত লাগায়। মুসৌরীতে একটি এবং দিল্লীতে হোটেল বসন্ত কন্টিনেন্টাল ও হোটেল সিদ্ধার্থ'র মালিক এরা। কোম্পানির মালিক জয়প্রকাশ গৌর জানিয়েছে যে, অর্থ-সংকটের জন্য মাত্র 160 কোটি টাকায় হোটেলগুলি বিক্রি করে দিতে তারা রাজী আছে। মিঃ গৌর এখন কোম্পানির অর্ধেকেরও বেশী শেয়ার বিক্রি করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে শ'ওয়ালেসের সঙ্গে (সেই শ'ওয়ালেশ, যার মালিক ছাবাড়িয়া ক্যালকাটা কেমিক্যালস্‌কে ছিবড়ে করে দিয়েছে) কথা চলছে। বিভিন্ন প্রকল্পের কাজেও কোম্পানি পার্টনার খুঁজছে। যেমন চামেরা-2 প্রকল্পর ঠিকাদারি পেলে এই কাজের জন্য কানাডার এক ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা এন এন সি লাভোলিন 40 শতাংশ শেয়ার কিনতে ও টাকা দিতে রাজী হয়েছে (সূত্র-ইকনমিক টাইমস, তারিখ 18. 05. 95)।

ঘটনা হল, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন যেভাবে নর্মদা প্রকল্পের কাজ আটকে দিচ্ছে তাতে ঠিকাদারদের অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। ঘুষের টাকা হয়ত বেশ কিছুটাই আগাম দিতে হয়। সেক্ষেত্রে আন্দোলন যদি গোটা প্রকল্পর কাজ আরও কয়েক বছর বন্ধ করে রাখতে পারে তবে ঠিকাদারদের তরফ থেকে হিংস্র আক্রমণ আসতে পারে ঠিকই কিন্তু রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশাসনকে ঘুষ দিয়ে যেভাবে এইসব ড্যাম ও বিদ্যুৎ প্রকল্প ঠিকাদাররা অনুমোদন করায় তাতে একটা ভাঁটা আসতে পারে হয়ত।

মূল রিপোর্ট : নিরঞ্জন হালদার

1956 সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 4 নং ফরম অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

Form IV

পত্রিকার নাম : বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

প্রকাশনার ভাষা : বাংলা ও ইংরেজী

প্রকাশনার স্থান : পি 252, লেক টাউন, ব্লক এ, কলিকাতা-700089

প্রকাশের কাল : ত্রৈমাসিক

প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা : রবীন মজুমদার, ভারতীয়,
কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
92, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-700009

মুদ্রকের নাম ও ঠিকানা—ঐ

সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা—ঐ

প্রেসের নাম ও ঠিকানা—ইটারনিটি প্রেস, 8 আশুতোষ শাস্ত্রী রোড, কলি-10-এর পক্ষে
প্রিন্টিং পাবলিসিটি, 117 কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলি-9
ফোন—350-7967 থেকে মুদ্রিত।

প্লুটোনিয়াম নয় ইউরেনিয়াম এবার

পরিক্রমা

গত সংখ্যার 'বি ও বি' তে খবর ছিল প্লুটোনিয়াম চুরির। সুদূর জার্মানীতে। চোরা চালানকারী ধরা পড়েছিল জার্মান বিমান বন্দরে। এবার ইউরেনিয়াম। অত দূরে নয়। একেবারে আমাদের দোর গোড়ায়। পাটনায়। বিমান বন্দরে নয়। নজরদারি এড়িয়ে শহরের এক হোটেলে। যার মূল্য অনুমান করা হচ্ছে দশ লক্ষ টাকার মত।

এই তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়ামটুকুর উৎস বিহারের যদুগোরা খনি। পাকাপোক্ত প্যাকিং-এই ভরা ছিল বস্তুটি। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ-রোধক আধারে। ওপরে চামড়ার মোড়কের ওপর ছাপা ছিল তারাপুর এটমিক পাওয়ার স্টেশনের ঠিকানা। বেহাত হওয়ার পর যাচ্ছিল কাঠমান্ডুর দিকে। লিংকম্যান হিসেবে ধরা পড়েছে একজন কলেজের ছাত্র।

সম্প্রতি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এবার মেঘালয়ে। কিলাং-ডোমিয়াসিক্ ইউরেনিয়াম খনি এলাকায়। ধরা পড়েছে একজন ড্রাইভার। তার কাছে পাওয়া গেছে আংশিক শোধিত আড়াই কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম। এর সাথে জড়িয়ে আছে সম্ভবতঃ একজন প্রাক্তন খনি-অফিসার। এর আগেও ইউরেনিয়াম খোয়া গেছে যার পরিমাণ পঁচানব্বই কেজি।

খনি কর্তৃপক্ষ এখনও বলছেন তাদের সিকিউরিটি ব্যবস্থায় কোন ফাঁক নেই! তবুও কিভাবে মাল হাত-সাফাই হচ্ছে তারা বুঝতে পারছেন না।

এই কথাটাই বারবার বলা হচ্ছে যে কোন সিকিউরিটি ব্যবস্থাই এই চোরা পাচার বন্ধ করতে পারে না। যেহেতু বস্তুটি নিছক সাধারণ সোনা-দানা-পয়সার ব্যাপার নয়। এজন্য যারা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা হেজি-পেজি লোকজন নন। তাদের ক্ষমতা ও অর্থবলের অভাব নেই—যার কাছে যে কোন শক্ত সিকিউরিটিই তরল হতে সময় লাগে না।

□ র. চ.

'মহিলা আউর বিস্থাপন' / একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন

বিভিন্ন প্রকল্প, তা সে কারখানা হোক কি বড় বাঁধ, মানুষকে ভিটে ছাড়া করেই। এ ঘটনা আমরা দূরের নর্মদা থেকে খুব কাছের বজবজ, সব জায়গাতেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই উৎখাত হওয়ার ফলে যাঁদের ওপর আঘাত এক বিশেষ তীব্রতা নিয়ে আসে তাঁরা হলেন আক্রান্ত এই সব পরিবারের মহিলারা।

এঁদের সমস্যা নিয়েই মন খুলে কথা বলার এক ব্যবস্থা করেছিল নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। মধ্য প্রদেশের ধার জেলার সাতৃতলাই গ্রামে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ভুক্তভোগী মহিলারা নিজেরাই নিজেদের কথা বলার চেষ্টা করেছেন।

যাদের কাছে 'ব্যবসা' শব্দের অর্থ হল অবাধ লুণ্ঠন ও পরিবেশের সামগ্রিক ধ্বংস, সেই বহুজাতিক পুঁজি ও তার স্থানীয় দালালদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হয়েছে পঁচিশ বছরের যুবক **নীলেশ নায়েক**।

তার 'অপরাধ' ছিল আমেরিকান এক বিশাল রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী সংস্থা ডু-পন্ট্ এবং তার এদেশী সহযোগী থাপারদের মালিকানাধীন গোয়ার বুকে তৈরী হতে যাওয়া বিতর্কিত নাইলন কারখানার বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হওয়া।

এ বছর জানুয়ারী মাসের 22 তারিখ, এক শীতের বিকেলে, কোন সাবধান-বাণী ছাড়াই, সরকারি অফিসারদের উপস্থিতিতে, রাষ্ট্রীয় তকমাধারি পুলিশ সামনাসামনি বুকে গুলি করে মারে নীলেশকে। সেই সময় সে অংশগ্রহণ করছিল শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত এক পথ অবরোধে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি-বর্ষণের প্রথম শিকার হন সামনের সারিতে থাকা নারী আন্দোলনকারীরা। মারাত্মকভাবে জখম হন তাঁদের কয়েকজনও।

এই ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্য প্রশাসনের পাশাপাশি আমরা দায়ী করছি প্রকল্প মালিকদেরও। নিরপরাধ মানুষের রক্তের দাগ তাদের হাতেও লেগেছে। কারণ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কাছে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে 'চরম কড়া ব্যবস্থা' নেবার জন্য তারা জোরাল দাবী জানিয়েছিল।

নীলেশের মৃত্যু আমাদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। শোক, বন্ধু-স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানানর পাশাপাশি আমরা গোয়ার জনস্বার্থ তথা পরিবেশ রক্ষা আন্দোনননের সাথে একযোগে জোরাল দাবী তুলছি ঃ

গোয়ার জনজীবন তথা ইকলজি ধ্বংসকারী নাইলন কারখানা প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হোক।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ ঃ অ্যান্টি নাইলন 6/6 সিটিজেনস্ কমিটি C/o দি আদার ইন্ডিয়া বুক স্টোর, অ্যাবভ মাপুসা ক্লিনিক মাপুসা-403507, গোয়া, ইন্ডিয়া।

একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে অভিজিত লাহিড়ী
পি 252, লেক টাউন,
ব্লক-এ কলকাতা-700089

আর এন 34929/79
সপ্তদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
এপ্রিল-জুন '95

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন

20 ডিসেম্বর, 1994—কলকাতার দ্য স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় ওই দিন প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয় এক মারাত্মক খবর—রাজস্থান নারী বিকাশ প্রকল্পর অফিসাররা 'অসুস্থ মা' এবং শিশুর জন্য বরাদ্দ খাদ্য বাইরে বিক্রী করে দিচ্ছে গরু মোষের খাবার হিসেবে। এছাড়া আরও অভিযোগ যে 68টা কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ খাবার, রান্নার তেল, ওষুধ, সাবান, তোয়ালে, খাবার প্লেট, জ্বালানী কাঠ ইত্যাদির প্রায় 50 শতাংশ গোপনে বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হোল, চুরি আটকাতে সচেষ্ট এক সৎ অফিসারকে সাংঘাতিকভাবে হেনস্থা করা হয়েছে, যা চরম শাস্তির সমতুল।

যাঁরা কাজ করেছেন—কম্পোজ ☐ গীতশ্রী সেন, স্বপন সেন, দুলাল বোস ॥ মেক আপ ☐ স্বপন সেন ॥ মেশিনম্যান ☐ মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ॥ বাইণ্ডিং ☐ লক্ষণ দাস ॥ মুদ্রক ☐ সমুদ্র ঘোষ।

বি ও বি-র পক্ষ থেকে ☐ শেখর, সত্যব্রত।

প্রচ্ছদ ☐ রবীন চক্রবর্তী, অলক।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি, 117, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-9, ফোন—350-7967 থেকে মুদ্রিত।